শাইখ আহমাদ ফরিদ সংকলিত
'তাযকিয়াতুন নুফূস্' গ্রন্থের অনুবাদ

পরিশুদ্ধ ক্বলব

অনুবাদ
ইলিয়াস আশরাফ

সম্পাদনা
মাহমুদ বিন নূর

জীবন আপন স্রোতে বহমান। বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর সমুদ্রের সম্মোহনে। আমি আপনি সকলেই এই পথের যাত্রী। কিন্তু এ জীবন তখনই কার্যকরী বলে গণ্য হবে, যখন তা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্বে ব্যয়িত হবে। সেজন্য প্রয়োজন অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা। নির্ভেজাল রাখা নিয়ত ও দাসত্বকে। নিজের নফসকে নিঃশর্ত নত করতে হবে আল্লাহর সামনে। প্রবৃত্তি কামনা বাসনা সাজাতে হবে প্রভুর আদেশনিষেধ অনুকূলে। নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে নফসে মুতমাইন্নার দলে। বক্ষমান বইটিতে আমরা আপনাকে নিয়ে অবগাহন করবো আত্মশুদ্ধির স্বচ্ছ সরোবরে। আপনাকে স্বাগতম।

১. ইবনু রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ
২. ইবনুল কাইয়ুম জাওযি রহিমাহুল্লাহ
৩. ইমাম আবু হামেদ গাযালি রহিমাহুল্লাহ

অর্পণ

প্রতিটি আত্মায় শুদ্ধতা ছুঁয়ে যাক

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, 'পরিশুদ্ধ ক্বলব' বইটি সম্পাদনা করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। (যদিও এর যোগ্য আমি নই) কেননা, এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে ছিল আমার জন্য নতুন নতুন বার্তা; নতুন নতুন শিক্ষা। এই বইয়ে লেখক এমন সব বিষয় সংকলন করেছেন, যা আপনার আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদনার প্রাক্কালে প্রতিটি পাতায় পাতায় নিজেকে খুঁজেছি। খুঁজেছি আমার ভুলে ভরা জীবনের বিষাক্ত অধ্যায়।

আত্মশুদ্ধি হচ্ছে প্রতিটি মুমিনের পাথেয়। আর সেই আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, পরিশুদ্ধ ক্বলব। পরিশুদ্ধ ক্বলব আপনার আমার জন্য কতটা জরুরী: কীভাবে অন্তর পরিশুদ্ধ করবেন—তা এই বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নিজেকে জানতে, নিজেকে চিনতে, নিজেকে বুঝতে—এই বইটা খুবই সহায়ক হবে, ইন শা আল্লাহ। আসুন, নিজেকে চিনি, নিজেকে খুঁজি; নিজেকে মুক্ত করি ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে। আসুন, ফুল হয়ে ফুটি; প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো গায়ে মেখে, নতুন করে সাজি!

মাওঃ মাহমুদ বিন নূর
লেখক ও সম্পাদক
১০/০৯/২০২১

অনুবাদকের কথা

আত্মা বা ক্বলব বনী আদমের চালিকাশক্তি। দেহ প্রজা, আত্মা রাজা। এ রাজার আদেশেই প্রজা তার সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেয়। তাই দেহের চেয়ে আত্মার শক্তি হয় বেশি। মূল্যের দিক থেকেও আত্মা অমূল্য, দেহ অতি তুচ্ছ।

মানুষ যতই দেহশক্তিসম্পন্ন হোক না কেন, যতই ধনসম্পদের মালিক হোক না কেন, যতই রূপলাবণ্যের অধিকারী হোক না কেন, যদি তার অন্তর শক্তিশালী প্রসন্ন ও সুন্দর না হয়, তাহলে তার শক্তি সম্পদ ও সৌন্দর্যের কানাকড়িও মূল্য নেই। মৃত্যুর সাথে সাথেই এই নিরেট বাস্তবতা আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত হয় অত্যন্ত করুণ রূপে।

জীবদ্দশায় আমাদের একটি নাম থাকে, থাকে পরিচয় পদবি। কিন্তু দেহ থেকে অন্তর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই আমরা আমাদের নাম পদবি সবকিছুই হারিয়ে বসি। অতি আপনজনও আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলে 'লাশ'। সৌন্দর্য তো তখন ধূলোয় মিশে যায়। আর সম্পদ চলে যায় অন্যের মালিকানায়।

অতএব, যেহেতু দেহের চেয়ে আত্মার মূল্য ক্ষমতা ও শক্তি বেশি, তাই আমাদের কর্তব্য হলো, দেহের পরিচর্যার চেয়ে আত্মার পরিচর্যার দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। কেননা আত্মা যদি কালিমাযুক্ত অপরিচ্ছন্ন হয়, তাহলে দেহের পরিশীলতা ও সৌন্দর্য কোনো কাজের নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাই আমাদের

খুবই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষের শরীরে একটি মাংসপিণ্ড আছে। যদি তা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে পুরো শরীর পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পুরো শরীরই বিনষ্ট হয়ে যাবে। শুনে রাখ, তা হলো ক্বলব (অন্তর)। (সহিহ বুখারী ৫২)

বক্ষমান বইটি আত্মশুদ্ধি বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। লিখেছেন মিশরের প্রখ্যাত দাঈ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক এবং বহুগ্রন্থ প্রণেতা শায়খ ডক্টর আহমদ ফরিদ। তিনি মূলত ইমাম গাজালি, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে রজব হাম্বলী প্রমূখ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের কিতাবাদি ও রচনা থেকে বাছাইকৃত কিছু আলোচনা এখানে সন্নিবেশিত করেছেন। যুগপৎ যুক্ত করেছেন কোরআনের অসংখ্য আয়াত, অনেক হাদীস এবং সাহাবি-সালাফদের প্রচুর মূল্যবান উপদেশ বাণী। পাঠক অবশ্যই বইটি পাঠ করার সময় বিষয়টি ঠাওর করতে পারবেন।

মাকতাবাতুল ক্বলব। সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি রুচিশীল প্রকাশনী। নামের সঙ্গে মিল রেখে এবং আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কারণে এই বইটিকে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমাদের সকলকেই নিষ্কলুষ পবিত্র আত্মা নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর তাওফিক দান করুন। যেন মরণের সাথে সাথে আমাদের কর্ণকুহরে মধুর তরঙ্গে দোলা দিয়ে যায় এই সুর: 'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে ফিরে এসো তোমার রবের কাছে। অতঃপর আমার প্রিয় বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে যাও এবং অবগাহন করো আমার জান্নাতে'। (সুরা ফজর ২৭-৩০)

অনুবাদক-
ইলিয়াস আশরাফ

লেখকের কথা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তাজকিয়াতুন নুফুস তথা আত্মশুদ্ধি। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

> তিনি উম্মিদের মাঝে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দিবে। আগে তো তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল। [১]

সুতরাং যারা আল্লাহকে পেতে চায়, আখিরাতের সাফল্য কামনা করে, তাদের জন্য নিজের আত্মশুদ্ধির প্রতি মনযোগী হওয়া ছাড়া কোনো গত্যান্তর নেই। কুরআনের একটি সুরায় আল্লাহ্‌ তায়ালা একাধারে এগারটি কসম করে অতঃপর বান্দার সফলতাকে যুক্ত করে দিয়েছেন নিজের আত্মার পরিশুদ্ধির

[১] সুরা জুমআ ২

ওপর। পুরো কুরআনে অন্য কোথাও এভাবে একাধারে এতো দীর্ঘ ও বিচিত্র কসমের সারি পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا ۝ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا

> কসম সূর্যের ও তার আলোর, কসম চাঁদের যখন তা সূর্যের অনুগামী হয়, কসম দিনের যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে, কসম রাতের যখন তা একে ঢেকে রাখে, কসম আসমানের এবং যিনি তা বানিয়েছেন তার, কসম জমিনের এবং যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন তার এবং কসম মানুষের অন্তরের ও সেই সত্তার যিনি তাকে সুষম করেছেন এবং তাদকে তার পাপ ও পুন্যের জ্ঞান দিয়েছেন; নিঃসন্দেহে সে সফলকাম, যে মনকে পবিত্র করেছে। আর যে তাকে কলুষিত করেছে, সে বিফল।[২]

আমাদের পূর্বসূরি উলামায়ে কেরাম তাজকিয়া সম্পর্কে অনেক কিতাব বইপত্র রচনা করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে কিছু আছে খুবই দীর্ঘ এবং বড়। তাই সমস্ত মুসলমান সেখান থেকে উপকৃত হতে পারে না। অনুরূপ কিছু বই আছে দুর্বল ও বানোয়াট বর্ণনা ও ঘটনাবলী দ্বারা ভরপুর। তাই তা পাঠ করা নিরাপদ নয়। তাই উম্মাহর উপকারের দিকে লক্ষ্য করে এই বিষয়ক সহিহ ও গ্রহণযোগ্য কিছু বর্ণনা উক্ত গ্রন্থে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। ইবনুল কাইয়িম, ইবনে রাজাব হাম্বলি এবং ইমাম গাজালির মতো প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরামের গ্রন্থ থেকে সেগুলো চয়ন করে এনেছি। আশা করি আল্লাহ্ তায়ালা এর দ্বারা লেখক, পাঠক ও প্রকাশককে উপকৃত করবেন। সম্মানিত করবেন ওই দিন 'যেদিন কোনো সম্পদ কিংবা সন্তানসন্তুতি কাজে আসবে না; তবে যে আসবে নিরাপদ অন্তর নিয়ে'। প্রশংসা সব আল্লাহর। তিনি আমাদের মাওলা। তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাবো।

---

[২] সুরা শামস ১-১১

যাত্রা শুরু করলাম পরিশুদ্ধ
ক্লবের পরিক্রমায়

ইখলাস

ইখলাস বলা হয়ঃ আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের অভিলাষকে যাবতীয় কালিমা থেকে মুক্ত করা; একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা।

অন্য কথায়ঃ আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত এবং আনুগত্যের প্রশ্নে আপোষহীন ও সদা নিবেদিতপ্রাণ থাকা।

আবার কেউ বলেন, 'স্রষ্টার দিকে অবিরত ধ্যানমগ্ন থাকার কারণে সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যাওয়াই হলো ইখলাস।

যাই হোক, যে সমস্ত আমালে সালেহা ও ইবাদত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী সম্পাদিত হবে, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হচ্ছে 'ইখলাস'। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে ইখলাসের আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন—

وَ مَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

> 'তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্য নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে'। [১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদিসেও ইখালাসের প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

---

[১] সুরা বাইয়িনা

আবু উমামা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিদান এবং সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে, তার ব্যাপারে আপনার কি মত?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> 'সে কিছুই পাবে না'।

লোকটি তার কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবারই তাকে এই উত্তর দিলেন যে, 'সে কিছুই পাবে না'।

অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> 'আল্লাহ্ তায়ালা শুধু ওই আমলই গ্রহণ করেন যা একনিষ্ঠ তাঁর জন্যই সম্পাদিত হয়েছে এবং একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টিই সেখানে কাম্য ছিল'।[২]

আবু সাইদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বিদায় হজ্বে বলেছেন—

> 'আল্লাহ্ তায়ালা ওই ব্যক্তিকে সমুজ্জ্বল করুন (তাকে সম্মানিত করুন), যে আমার বাণী শুনে এবং মুখস্থ করে; এমন কতই না জ্ঞানের বাহক রয়েছে, যে ফকিহ (জ্ঞানী) নয়। তিনটি জিনিষের ব্যাপারে কোনো মুমিন ব্যক্তির অন্তরে হিংসা প্রবেশ করতে পারে নাঃ ১- আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ আমল। ২- মুসলমানদের নেতৃবৃন্দকে নসিহত করা (সদুপদেশ দেওয়া)। ৩- মুসলমানদের জামাআতকে আঁকড়ে ধরা'।[৩]

'কোনো মুমিন ব্যক্তির অন্তরে হিংসা প্রবেশ করতে পারে না' এই কথার মর্ম হলো—উক্ত তিনটি বিষয় দ্বারা অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জন হয়। অতএব

[২] সুনানে নাসাঈ ৩১৪০; সহিহ তারগিব ওয়াত তারহিব ৮; হাদিসটি সহিহঃ তারগিব তারহিব, মুনজিরি ১/২৪, ফাতহুল বারি, হাফিজ ইবনে হাজার ৬/২৮

[৩] সহিহ; ইবনে মাজাহ ২৩০; সহিহ তারগিব ওয়াত তারহিব ৪

যে ব্যক্তি এই তিনটি গুণে গুণান্বিত হবে, তার অন্তর কপটতা, অনিষ্ট এবং ফ্যাসাদ থেকে পবিত্র থাকবে।

ইখলাস ব্যতীত কেউ চাইলেও শয়তান ও তার ধন্দ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না। ইবলিস, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কথোপকথনের সময় বলেছিল—

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

> 'আপনার সম্মানের কসম, আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো; আপনার মুখলিস (একনিষ্ঠ) বান্দাগণ ব্যতীত'। [৪]

পার্থিব জীবনের যত সুখ ও ভোগবিলাস রয়েছে, যেগুলোর প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয়, যেসব দ্বারা মানুষ আত্মপ্রশান্তি লাভ করে, তা বেশি হোক বা কম, যখন সেখানে আমলের ছোঁয়া লাগে, তখনই তার নির্মল আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা যায় এবং মানুষের ইখলাস দূর হয়ে যায়।

আর যে মানুষ ভোগবিলাসে মত্ত, কামনার সাগরে নিমজ্জিত, তার খুব স্বল্প সংখ্যক কাজ এবং সামান্য কিছু ইবাদতই পার্থিব উদ্দেশ্য ও স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এজন্যই বলা হয়, 'যার জীবনের এক লহমাও আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয়িত হয়, সে সফলকাম'। কেননা 'ইখলাস' বড় দুর্লভ জিনিষ; যাবতীয় কর্দম থেকে কারও অন্তর পরিচ্ছন্ন হওয়া, খুবই বিরল।

ইখলাস হলো, কম হোক বেশি, যাবতীয় কলুষ থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া; অন্য কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য অন্তরের কোণে উঁকি না মারা। আর এমনটি একমাত্র ওই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে আল্লাহ্ তায়ালার ভালোবাসায় নিমগ্ন, আখিরাতের চিন্তায় আবিষ্ট। যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসার কোনো স্থান নেই। এমন ব্যক্তির পানাহার এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মও খালেস আমলে পরিগণিত হয়, তার নিয়ত থাকে নিষ্কলঙ্ক।

---

[৪] সুরা সদ ৮৩

পক্ষান্তরে যে এমন হতে পারবে না, ইখলাসের দরজা তার জন্য রুদ্ধ। তবে বিরল কোনো ঘটনায় কখনো পেলেও পেয়ে যেতে পারে।

যার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা, পরকালের ভালোবাসা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, তার সমস্ত কাজ এমনকি স্বাভাবিক চলনগমনেও আল্লাহ্ ও পরকালের ভাবনা ও আভা প্রস্ফুটিত হবে এবং তা ইখলাসে রূপান্তরিত হবে। পক্ষান্তরে যার অন্তরে দুনিয়া, ধনসম্পদ, ক্ষমতা- এক কথায় আল্লাহভিন্ন সব কিছুর জয়জয়কার, তার সমস্ত কাজেও এগুলোর প্রভাব প্রকট হয়ে দেখা দেবে। কাজেই তার নামায, রোজা ইত্যাদি কোনো ইবাদতই সাধারনত নির্মল হবে না। তবে কালেভদ্রে হতেও পারে।

ইখলাসের চিকিৎসা

ইখলাসের চিকিৎসা হলো, অন্তরের যাবতীয় কামনাকে পরাস্ত করা, পার্থিব সমস্ত লোভ লালসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং আখিরাতের জন্য অভিনিবিষ্ট হওয়া; যেন অন্তরে আখিরাতেরই একচ্ছত্র ক্ষমতা পরিচালিত হয়। তাহলেই ইখলাসের পথ সুগম হয়ে যাবে। কতো মানুষ কতো শত আমল করে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলে আর ধারণা করতে থাকে যে, তা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্যই সম্পাদিত হচ্ছে। অথচ সে প্রবঞ্চিত; কেননা সে আসল রোগের চেহারাটাই উদঘাটন করতে পারে নি।

এক ব্যক্তি সর্বদা মসজিদের প্রথম কাতারে নামায আদায় করতো। একদিন প্রথম কাতার পায় নি বিধায় দ্বিতীয় কাতারে সালাত আদায় করে। লোকজন তাকে দ্বিতীয় কাতারে সালাত আদায় করতে দেখেছে, এই ভাবনায় তার অন্তরে লজ্জার উদ্রেক হলো। তখন সে অনুভব করলো যে, তার প্রথম কাতারে নামায পড়তে ভালো লাগতো এবং তা তার নিকট অতি প্রিয় ছিল এই কারণে যে, 'মানুষ তাকে দেখছে'।

বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম এবং রহস্যময়। খুব কম আমলই মুক্ত থাকে এমন ভাবনা থেকে। এর প্রতি সজাগ সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খুবই স্বল্প মানুষ; তবে আল্লাহ্ তায়ালা যাদের তাওফিক দান করেন, তারাই পারেন। যারা এ ব্যাপারে অচেতন অসতর্ক, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের যাবতীয় আমল গুনাহে রূপান্তরিত অবস্থায় দেখতে পাবে। তারাই আল্লাহ্ তায়ালার

নিম্নোক্ত বাণীদ্বয়ের মূল উদ্দিষ্টঃ

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝ وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا

> 'সেদিন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু (শাস্তি) প্রত্যক্ষ করবে, যা তাদের ধারণাতেই ছিল না। তারা যা আমল করেছিল, তার মন্দ ফল তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে'।[৫]

অন্যত্র বলেন—

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

> 'বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাবো, যাদের কর্মসমূহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে, তারা ভালো কাজ করছে!'[৬]

ইখলাস সম্পর্কে সালাফদের কিছু উক্তি

ইয়াকুব রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুখলিস (একনিষ্ঠ) ওই ব্যক্তি, যে নিজের গুনাহ ও মন্দকাজগুলো যেভাবে গোপন রাখে, সেভাবে নিজের নেক কাজগুলোও গোপন রাখে'।

সুসি রহিমাহুল্লাহ বলেন—'ইখলাস হলো ইখলাসকে না দেখতে পারা; যে ব্যক্তি নিজের ইখলাসের মধ্যে ইখলাস প্রত্যক্ষ করে, তার ইখলাস ইখলাসের মুখাপেক্ষী'।

উক্ত কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিজের আমলকে আত্মশ্লাঘা থেকে নির্মল

[৫] সুরা যুমার ৪৭

[৬] সুরা কাহাফ ১০৩-১০৪

রাখা। কেননা নিজের আমলকে ইখলাস-মণ্ডিত করা আবশ্যক। কিন্তু
নিজেকে মুখলিস একনিষ্ঠ ভাবা এবং তার দিকে পরিতৃপ্তির দৃষ্টিতে তাকানো
এটাও একটা বড় ব্যাধি। যার নাম হলো 'উজব' তথা শ্লাঘাবোধ। আর
একনিষ্ঠ তো তাই হয়, যা সমস্ত আপদ ও ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়। তাই এমন
ব্যক্তির ইখলাসের মধ্যেও সমস্যা দেখা দেয়। ফলে তার ইখলাসও নতুন
করে পরিশুদ্ধির মুখাপেক্ষী।

আইয়ুব রহিমাহুল্লাহ বলেন—'আমলকারিদের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ
হলো নিয়তকে স্বচ্ছ করা'।

কেউ বলেছেন, 'এক মুহূর্তের ইখলাসই চিরকালীন নাজাতের জন্য যথেষ্ট;
কিন্তু ইখলাস বড়ই দুর্লভ'।

সুহাইল রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'মানুষের নফসের জন্য কোন
জিনিষ সবচেয়ে বেশি কষ্টকর?' তিনি বললেন, 'ইখলাস; কেননা অন্তরের
ইখলাস খুবই বিরল জিনিষ'।

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন—'মানুষ দেখে এজন্য আমল ছেড়ে
দেওয়া 'রিয়া' তথা আত্মপ্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষকে দেখানোর জন্য
আমল করা হলো শিরক। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে উভয় থেকে নিরাপদ
রাখেন, এটিই হলো ইখলাস'।

নিয়তঃ পরিচয় ও তাৎপর্য

মুখে মুখে *'নাওয়াইতু'* বা *'আমি নিয়ত করলাম'* বলা, এর নাম নিয়ত নয়। বরং নিয়ত হলো অন্তরের একটি আবেগ, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার অন্তরে উদয় হয়। কোনো কোনো সময় নিয়ত অত্যন্ত সহজ। আবার কখনো হয়ে যায় তীব্র কঠিন। তবে যার অন্তরে দ্বীনের দরদ আছে প্রচুর, অধিকাংশ সময়ই ভালো কাজের বেলায় তার জন্য নিয়ত করা সহজ হয়ে যায়। তার অন্তর সাধারণত কল্যাণের মূল উৎসের দিকে ঝুঁকে থাকে। তাই অতি সহজেই তার অন্তরে সে আবেগ তৈরি হয়।

পক্ষান্তরে যার অন্তর দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট। পার্থিব জীবনের লালসা যার অন্তরে বিরাজমান। তার জন্য নিয়ত সহজসাধ্য নয়। এমনকি ফরজ আমলগুলোতেও সে অনেক কষ্টে নিয়ত উপস্থিত করতে পারে।

উমর রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> 'সমস্ত কাজ (তার প্রতিদান কিংবা যথার্থতা) নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির উদ্দ্যেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্যই গৃহীত হবে। অনুরূপ যার হিজরত হবে পার্থিব জীবন কিংবা কোনো নারীর উদ্দ্যেশ্যে, তার হিজরত সে জন্যই পরিগণিত হবে'।[১]

[১] সহিহ বুখারি ১; সহিহ মুসলিম ৪৮২১

এই হাদিসের ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী রহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করেছেন, 'এই হাদিসের মধ্যে ইলমের এক তৃতীয়াংশ নিহিত আছে'।

'সমস্ত কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল' এই কথার অর্থ হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী সম্পাদিত আমলের যথার্থতা নির্ভর করে নিয়তের পরিশুদ্ধির ওপর।

'প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে' এই কথার ব্যাখ্যা হলো, আমলকারি নিজ আমলের প্রতিদান পাবে তার শুভ্র নিয়ত অনুপাতে। যদি সে একটি কাজে একাধিক ভালো নিয়ত করে, তাহলে সে এক কাজের জন্যই একাধিক সওয়াব অর্জন করবে।

'যার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, তাঁর হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্যই হবে। অনুরূপ যার হিজরত হবে ইহকাল কিংবা কোনো নারীর জন্য, তাহলে তার হিজরতও সে জন্যই হবে' এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করে এই পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, একই কাজ নিয়তের ভিন্নতার দরুন প্রতিদান ও যথার্থতার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে।

ভালো নিয়ত দ্বারা গুনাহের কাজ সওয়াবের কাজে পরিণত হয় না। 'সমস্ত কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল' এর ব্যাপকতা থেকে কেউ যেন এমন ফলাফল বের না করে যে, গুনাহের কাজও নিয়তের সুচিতার কারণে সওয়াবের কাজে পরিণত হবে। বস্তুত আমল কিংবা কাজ সাধারণত তিন ধরণেরঃ ১- সওয়াবের কাজ। ২- শরীয়তবৈধ মুবাহ কাজ। ৩- গুনাহের কাজ। এর মধ্যে সওয়াবের কাজ নিয়তের কারণে গুনাহের কাজে পরিণত হতে পারে। তদ্রূপ মুবাহ কাজ নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব ও গুনাহ উভয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।[২] কিন্তু গুনাহের কাজ কখনো নিয়তের

---

[২] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিসে এর দলিল পাওয়া যায়। আবু যর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ভালো কাজের আদেশ দেওয়া একটি সদকা, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ও বাঁধা দেওয়া একটি সদকা এবং নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা' (অর্থাৎ সওয়াবের কাজ)। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে, এজন্যও সে সওয়াব পাবে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যদি কেউ হারাম স্থানে নিজ কামনা মেটাত, তাহলে কি তার গুনাহ হতো না! তেমনি যদি হালাল ভাবে কামনা মেটায়, এর জন্যও সে সওয়াব পাবে'। সহিহ মুসলিম ২২১৯

কারণে সওয়াবের কাজে রূপান্তরিত হতে পারে না। উপরন্তু যদি ভালো নিয়ত নিয়ে গুনাহের কাজে প্রবেশ করা হয় এবং দূষিত কাজ করা হয়, তখন তার শাস্তি এবং অভিশাপ হবে আরও দ্বিগুণ।

সওয়াবের কাজ মূলগতভাবে শুদ্ধ হওয়া এবং এর প্রতিদান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়তের সাথে সংযুক্ত। সুতরাং মূলগতভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত তথা দাসত্বের নিয়ত করতে হবে। যদি লোকদেখানোর উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তা গুনাহের কাজে পরিণত হবে। অনুরূপ একটি সওয়াবের কাজে একাধিক ভালো নিয়ত করলে সওয়াবের পরিমাণও সে অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে।

পক্ষান্তরে মুবাহ তথা শরীয়তবৈধ কাজে ভালো মন্দ উভয় নিয়তেরই সুযোগ আছে। ভালো নিয়ত করলে তা আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হবে এবং তার দ্বারা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া সম্ভব। আবার খারাপ নিয়ত করলে তা গুনাহের কাজে রূপান্তরিত হবে এবং পরিগণিত হবে আজাবের মাধ্যম হিসেবে ।

নিয়তের পূর্বিতা

উমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'সবচেয়ে উত্তম আমল হলো, আল্লাহ্ তায়ালার ফরজ বিধানগুলো আদায় করা, আল্লাহ্ তায়ালা যা হারাম করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকা[৩] এবং প্রতিদানের জন্য নিয়তকে নিষ্কলুষ করা'।

জনৈক সালাফ বলেছেন—'অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজও নিয়তের কারণে বিশাল আকার ধারণ করে। আবার অনেক বিরাট বিরাট কাজ নিয়তের কারণে হয়ে যায় তুচ্ছ'।

ইয়াহিয়া বিন আবু কাসির রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'তোমরা

[৩] আবু ইসহাক সিরাজি রাহ এর খোদাভীতির একটি বিস্ময়কর ঘটনাঃ একদিন অভ্যাসমত খানা খাওয়ার জন্য বাজারে গেলেন। গিয়ে দেখলেন পকেটে দীনার নেই। তাঁর স্মরণ হল, দীনার তো রাস্তায় পড়ে গেছে। তিনি সেখানে ফিরে গেলেন। দীনারটি যেখানে পড়েছিল, সেখানেই পেলেন। কিন্তু তিনি তা স্পর্শ করলেন না। বরং বললেন, হতে পারে এটি আমার দীনার নয়; অন্য কারও পকেট থেকে পড়েছে! (তাহযিবুল আসমা, নববি ১/১৭৩)

নিয়তকে ভালো করে আত্মস্থ করো; কেননা তা আমলের চেয়েও কার্যকরী'।

ইবনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা একবার এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে এই দোয়া করছেঃ 'হে আল্লাহ্, আমি হজ্ব ও উমরা করতে চাই'। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কি মানুষকে জানাচ্ছ? আল্লাহ্ কি তোমার মনের কথা জানেন না!'

নিয়ত হলো অন্তরের ইচ্ছা ও আবেগের নাম; ইবাদতের ক্ষেত্রে তা মুখে উচ্চারণ করে বলা আবশ্যক নয়। [৪]

[৪] জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলি ১৯

ইলম অর্জন এবং শিক্ষাদানের মর্যাদা

কুরআনে কারিম এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে শরীয়তের ইলম তথা জ্ঞান অর্জন এবং শিক্ষাদানের অনেক ফজিলত বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

> তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের মর্যাদা সমুন্নত করে দেবেন।[১]

অন্যত্র বলেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

> 'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি কখনো সমান হতে পারে?'[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'আল্লাহ্ তায়ালা যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের

[১] সুরা মুজাদালা ১১

[২] সুরা যুমার ৯

জ্ঞান দান করেন'।[৩]

অন্যত্র বলেছেন—

> 'যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্য জান্নাতের রাস্তা সুগম করে দেন।'[৪]

'ইলম অর্জনের জন্য পথ চলা'—এর মূল মাধ্যম হলো পায়ে হেঁটে উলামায়ে কেরামের মজলিসে যাওয়া। তবে ইলম অর্জনের যাবতীয় মাধ্যম, পন্থা এবং পরোক্ষ উপকরণও এর অন্তর্ভুক্ত।

'আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্য জান্নাতের রাস্তা সুগম করে দেন'- এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য কাঙ্ক্ষিত ইলম সহজলভ্য করে দেবেন। সে তা অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। এজন্যই ইলমকে জান্নাতে যাওয়ার একটি পথ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

আবার জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা বলতে কিয়ামতের দিনের কথাও উদ্দেশ্য হতে পারে। সিরাত অতিক্রম এবং তার আগেপরের বিষয়াদিও এর ব্যাখ্যায় বলা যায়।

জনৈক সালাফ বলতেন, 'সাহায্য-সহযোগিতা লাগবে এমন কোনো তালিবুল ইলম তথা ইলম অন্বেষণকারী আছে!' অর্থাৎ তালিবুল ইলমকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে তিনিও জান্নাতের পথে আরেক পা অগ্রসর হয়ে যেতে চাইছেন।

ইলম, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার নিকটতম একটি উপায়। যে ইলমের পথে চলবে, সে অত্যন্ত সহজভাবে আল্লাহ্ তায়ালা এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তদ্রুপ ইলম মূর্খতার অন্ধকার, সংশয় এবং দ্বিধা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি আলোকবর্তিকা। তাই তো আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন 'নুর' তথা আলোক।

---

[৩] সহিহ বুখারি ১/১৯৭; সহিহ মুসলিম ৭/১২৮

[৪] সহিহ মুসলিম ১৭/২১, ৬৭৪৬

আবদুল্লাহ বিন উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> ‘আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে একবারে ইলম ছিনিয়ে নেবেন না; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ জাহেল মূর্খদের অনুসৃত বানিয়ে নেবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা ইলমহীন ফতোয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরা ভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও ভ্রষ্ট করবে।’[৫]

উক্ত হাদিস সম্পর্কে উবাদা বিন সামিত রদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘তুমি যদি চাও, তাহলে আমি বলতে পারি, মানুষ থেকে কোন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তা হলো, খুশু তথা একাগ্রতা’।

উবাদা বিন সামিত রদিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা বলার কারণ হলো, ইলম দুই ধরণের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো ওই ইলম যা মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে পরিশুদ্ধ করে। আর তা হলো- আল্লাহ্ তায়ালার সত্ত্বা, তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানা এবং তাঁর ভয়, গাম্ভীর্য, সম্মান, ভালোবাসা, আশা, এবং নির্ভরতা-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করা। এই জ্ঞানই হলো উপকারি জ্ঞান। একাগ্রতা ও খুশুর সম্পর্ক অন্তরের সাথেই। সুতরাং উবাদা রদিয়াল্লাহু আনহু কেমন যেন অন্তরের জন্য উপকারী ইলম উঠিয়ে নেওয়ার আশংকা প্রকাশ করছেন।

ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘কিছু মানুষ কুরআন পাঠ করে। কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠাস্থি অতিক্রম করে না। তবে যদি তা অন্তরে প্রবেশ করে এবং প্রোথিত হয়ে যায়, তখন তা উপাদেয় হয়ে যায়’।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন—‘ইলম দুই প্রকারঃ এক প্রকার ইলম মানুষের জিহ্বার সাথে সম্পৃক্ত। এই ইলম মানুষের বিপক্ষ-দলিল হিসেবে গণ্য (অর্থাৎ মানুষের জন্য ক্ষতিকর)। যেমন হাদিসে আছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কুরআন, হয়তো তোমার পক্ষে অথবা

[৫] সহিহ বুখারি ১০০

বিপক্ষে’। [৬]

‘আরেক প্রকার ইলম মানুষের কলব-সংশ্লিষ্ট। এটিই হলো উপাদেয় ইলম। তবে সর্বপ্রথম উঠিয়ে নেওয়া হবে এই উপাদেয় ইলম। যা কলবের সাথে মিশে যায় এবং তাকে পরিশুদ্ধ করে। পরিশেষে বাকি থাকবে জিহ্বা-সংক্রান্ত ইলম। মানুষ তা তাচ্ছিল্যের সাথে গ্রহণ করবে। সে অনুযায়ী আমল করবে না: ইলম বহনকারীরাও না, অন্যরাও না। অতঃপর এই ইলমও বিলীন হয়ে যাবে, তার বহনকারীদের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দ্বারা। তখন সর্বনিকৃষ্ট মানব সভ্যতার ওপর কিয়ামত সংঘটিত হবে’।

---

[৬] সহিহ মুসলিম ২২৩

ক্বলব

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন—

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

> 'নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে'।[১]

কলব, সমস্ত অঙ্গের জন্য কার্যনির্বাহক শাসকের ন্যায়। তার নির্দেশনা অনুযায়ী সবাই চলে। সে নিজ ইচ্ছামতো এসব ব্যবহার করে। সমস্ত অঙ্গই তার অধিনস্ত এবং আওতাধীন। কাজেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিচ্যুতি এবং অবিচলতা নির্ভরশীল কলবের অবিচলতা ও বিচ্যুতির ওপর। এই বাস্তবতাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

'শুনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি মাংসখণ্ড রয়েছে। তা ঠিক থাকলে পুরো শরীর ঠিক থাকে। আর তা বিপথে গেলে গোটা শরীর বিপথে যায়। মনে রেখো, তা হলো কলব।'[২]

কলব হলো পুরো শরীরের রাজা। শরীর তার সমস্ত আদেশ বাস্তবায়ন করে। তার জন্য যত উপঢৌকন আসে, যেমন কামনা বাসনা লোভ লালসা ইত্যাদি, সবকিছুই শরীর গ্রহণ করে। কলব থেকে কোনো আদেশ ও সংকল্প জারি না হওয়া পর্যন্ত শরীর কোনো কাজেই অবিচল থাকতে পারে

[১] সুরা ইসরা ৩৬

[২] সহিহ বুখারি ৫২

না। তাই পুরো শরীরের ব্যাপারে কলবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে; কেননা প্রত্যেক দায়িত্বশীল তার অধিনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। কাজেই কলব যেহেতু এতো গুরুত্বপূর্ণ, তাই আল্লাহ্ওয়ালাগণ তাকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করার প্রতিই অধিক মনোযোগ দিয়েছেন। তার রোগ এবং প্রতিষেধক নিয়েই গবেষণা করেছেন ধার্মিক তাপসগণ।

ক্বলবের প্রকারভেদ

কলবের মাঝে জীবন মরণ উভয় গুণই বিদ্যমান। সে দিক বিবেচনায় কলবকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ঃ ১- সুস্থ ও নিরাপদ কলব। ২- মৃত কলব। ৩- অসুস্থ কলব।

১- সুস্থ ও নিরাপদ অন্তর

কিয়ামতের দিন ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে এই অন্তর নিয়েই উপস্থিত হতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

> 'যেদিন সন্তানসন্ততি এবং ধনসম্পদ কোনো কাজে আসবে না। কেবল সে ছাড়া যে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ অন্তর নিয়ে'।[৩]

সুস্থ অন্তর কী?

সুস্থ অন্তর হলো ওই অন্তর, যা আল্লাহ্ তায়ালার আদেশনিষেধবিরোধী সর্ব প্রকার কামনা বাসনা চাহিদা শখ ও অভিলাষ থেকে মুক্ত। নিজ কল্যাণবিরোধী সমস্ত সংশয় থেকে পবিত্র। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব থেকে নিরাপদ। তাঁর রাসুল ছাড়া অন্য কারও অনুসরণ থেকে নির্মল। তার দাসত্ব আল্লাহ্ তায়ালার জন্য একনিষ্ঠ। ইচ্ছায়, ভালোবাসায়, ভরসায়, বিনয়ে, তাওবায়, ভয়ে, আশায়। তার সমস্ত কাজ আল্লাহর জন্য ঐকান্তিক। সে ভালোবাসলে, আল্লাহর জন্য বাসে। ঘৃণা করলে আল্লাহর জন্যই ঘৃণা

[৩] সুরা শুয়ারা ৮৯

করে। দান করলে আল্লাহর জন্য দান করে। আল্লাহর জন্যই নিষেধ করে, যদি নিষেধ করে। এতটুকুতেই সে ক্ষান্ত হয় না; বরং আল্লাহর রাসুলের বিপরীত সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন থাকে। তার অভিলাষকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমনভাবে যুক্ত করে যে, একমাত্র তাঁরই অনুসরণ অনুকরণ করে। কথায় কাজে আকিদা বিশ্বাসে আপোষহীন। তাঁর বিপরীত কোনো কথা বলে না, কোনো কাজ করে না ও কোনো আকিদাও লালন করে না। এই হলো সুস্থ অন্তরের পরিচয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِه،

> 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সামনে কোনো কিছু এগিয়ে দিও না' (অর্থাৎ তাদের আগে কোনো সিদ্ধান্ত নিও না; তাদের বিরোধিতা করো না)।' [৪]

২- মৃত অন্তর

এটা সুস্থ অন্তরের পরিপূর্ণ বিপরীত। সে তার রবকে চেনে না। তাঁর আদেশ অনুযায়ী চলে না। তাঁর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে না। বরং সে নিজ কামনা ও ভোগবিলাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে; এতে তার রব সন্তুষ্ট কি রুষ্ট তা দেখার কোনো কসরত করে না। সে গাইরুল্লাহ'র দাসত্ব করে। ভালোবাসলে নিজের কামনা অনুযায়ী ভালোবাসে। ঘৃণা করলে নিজের প্রবৃত্তির জন্য ঘৃণা করে। দান করলে নিজের বাসনা অনুসারে দান করে। নিজের ঝোঁক অনুযায়ী নিষেধ করে, যদি নিষেধ করে। তার কামনাই তার কাছে তার রবের চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং প্রিয়। কামনা তার পথিকৃৎ, তার সেনাপতি হলো প্রবৃত্তি। মূর্খতা তার চালক, তার বাহন হলো উদাসীনতা। সে তার পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের চিন্তায় বিভোর। দুনিয়ার ভালোবাসা এবং প্রবৃত্তির নেশায় বুঁদ। দূর থেকে তাকে আল্লাহ্ এবং পরকালের দিকে আহ্বান করা হয়, সে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না; বরং প্রত্যেক অবাধ্য নিকৃষ্ট শয়তানের অনুসরণ করে। দুনিয়াকে ঘিরেই তার সুখ দুঃখ আবর্তিত।

[৪] সুরা হুজুরাত ১

বাতিল ও মিথ্যার প্রতি প্রবৃত্তির তাড়নায় সে অন্ধ এবং বধির।

এ ধরণের অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে মেলামেশা করা একটি রোগ। তার সাহচর্য একটি বিষ। তার সঙ্গের ওপর নাম ধ্বংস।

৩- অসুস্থ অন্তর

অসুস্থ অন্তর হলো এমন অন্তর যার মধ্যে জীবনের কিছু আভা রয়েছে। আবার কিছু অসুস্থতাও বিদ্যমান। সে একবার জীবনের দিকে ছোটে। আরেকবার ধাওয়া করে অসুস্থতার পেছনে। কোনো একটি দিক তার মধ্যে স্থির হয় না। তার মধ্যে জীবনের উপকরণ রয়েছে কিছু। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার ভালোবাসা, তাঁর প্রতি ঈমান, তাঁর প্রতি কিছুটা একনিষ্ঠতা, তাঁর ওপর ভরসা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কামনার ভালোবাসা, প্রবৃত্তির অগ্রগামিতা, বাসনা অর্জনে লালসা, হিংসা,[৫] অহমিকা,[৬] দম্ভ- এসব তার রোগের উপকরণ। যুগপৎ তার ধ্বংস এবং নিষ্ক্রিয় হওয়ার ধাতু। সে দুজন নিমন্ত্রণকারীর কাছে বাধিতঃ একজন তাকে আল্লাহ্, রাসুল এবং আখিরাতের দিকে আহ্বান করে। অপরজন তাকে ইহকালিন জীবনের দাওয়াত দেয়। সে নিজ সুবিধামতো নিকটবর্তীকে গ্রহণ করে। প্রতিবেশীকে জড়িয়ে নেয় গলায়।

প্রথম অন্তর উজ্জীবিত, বিনয়ী, সতর্ক এবং বাধ্য। দ্বিতীয় অন্তর শুষ্ক, নির্জীব ও মৃত। তৃতীয় অন্তর অসুস্থ; সে হয়তো নিরাপদের দিকে ধাবিত হবে কিংবা ধ্বংসের সাগরে ডুব দেবে।

কলবের সুস্থতা ও অসুস্থতার নিদর্শনাবলী

কলবের অসুস্থতার নিদর্শন

মানুষের অন্তর অসুস্থ হয়। অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করে। তবে মানুষ কখনো কখনো তা অনুধাবন করতে পারে না । এমনকি এক সময় অন্তর

[৫] হাসাদ তথা হিংসা বলা হয়—কোনো মুসলমানের কোনো নিয়ামত দেখে তা অপছন্দ করা এবং তার ধ্বংস কামনা করা। এটি নিন্দিত।

[৬] কিবর তথা অহমিকা বলা হয়ঃ আল্লাহ্র বান্দাদের ওপর অহংকার প্রদর্শন করা, তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এবং তাদের ওপর নিজেকে বড় মনে করা।

মারা যায় কিন্তু ব্যক্তি তার মৃত্যু সম্পর্কে থাকে অনবগত। অন্তরের অসুস্থতা কিংবা মৃত্যুর কিছু নিদর্শন হলোঃ গোনাহের আঘাতে ব্যক্তি কষ্ট না পাওয়া। সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং নিজের ভ্রষ্ট আকিদা তাকে ব্যথিত না করা। অন্তর যদি জীবিত থাকতো, তাহলে তার ওপর মন্দের আগমন এবং সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সে ব্যথা ও আক্ষেপ অনুভব করতো।

আবার কখনো কখনো সে রোগের কথা অনুভব করতে পারে কিংবা ঔষধ গ্রহণ করার পর তার তিক্ততা তার কাছে প্রকট অসহ্য লাগে, তখন সে ঔষধের কষ্ট ফেলে দিয়ে রোগের ওপর অবশিষ্ট থাকাকেই প্রাধান্য দেয়।

কলবের আরও একটি ব্যাধি হলো, সে উপাদেয় খাদ্য পরিহার করে ক্ষতিকর খাবার গ্রহণ করে। উপকারী ঔষধ বাদ দিয়ে আঁকড়ে ধরে অনিষ্টকর রোগকে । পক্ষান্তরে সুস্থ অন্তর অনিষ্টকর মন্দ খাবারের চেয়ে আরোগ্যকর উৎকৃষ্ট খাবারকেই অগ্রাধিকার দেয়। কলবের জন্য সবচেয়ে উপকারী খাবার হলো ঈমানের খাবার এবং সবচেয়ে কার্যকরী ঔষধ হলো কুরআনের ঔষধ।

কলবের সুস্থতার আলামতসমূহ

দুনিয়াকে সর্বতভাবে ত্যাগ করে আখিরাতের বাহনে অবগাহন করা। পরকালে এমনভাবে নিবিষ্ট হওয়া কেমন যেন সে সেখানেরই বাসিন্দা, সেখানেই তার আবাসস্থল। তার অবস্থা এমন হয় যে, সে এই দুনিয়ায় এসেছে মুসাফির হিসেবে; প্রয়োজন পূরণ হলেই পুনরায় ফিরে যাবে আপন নীড়ে, নিজ দেশে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ বিন উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেছেন—

> 'দুনিয়াতে এমনভাবে অবস্থান করো, যেন তুমি মুসাফির কিংবা একজন পথিক মাত্র'।[৭]

পক্ষান্তরে কলব যখন অসুস্থ হয়, তখন সে ইহজীবনকে প্রাধান্য দেয়। এখানেই নিজের আবাসস্থল বানিয়ে নেয়। এখানকার অধিবাসী হয়ে থেকে যেতে চায় চিরস্থায়ী।

[৭] সহিহ বুখারি ৬৪১৬

কলবের সুস্থতার আরও একটি আলামত হলোঃ সে তার অধিকারীর ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, যতক্ষণ না সে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর দিকে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবেশ গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে এমনভাবে মগ্ন হয়ে যায়, যেমনটা পাগল প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের প্রতি হয়ে থাকে। আল্লাহর ভালোবাসা গ্রহণ করে সে অন্য সমস্ত ভালোবাসাকে ত্যাগ করে। তাবৎ দুনিয়ার স্মরণ ছেড়ে তাঁর স্মরণেই ধ্যাননিবিষ্ট থাকে। সব কিছুর সেবা ছেড়ে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

অন্তরের সুস্থতার একটি নিদর্শন হচ্ছেঃ যদি তার প্রাত্যহিক কোনো অজিফা কিংবা কোনো সওয়াবের কাজ হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন সে তার জন্য এমনভাবে ব্যথিত হয় যে, লোভী কৃপণ লোক তার মূল্যবান সম্পদ হারালেও অতোটা ব্যথিত হয় না।

আরও একটি আলামত হলো—সে সেবা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে যায় তেমন, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি পানাহারের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেমন। ইয়াহিয়া বিন মুয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর খেদমত করতে পেরে যার অন্তর প্রশান্ত হয়, সমস্ত সৃষ্টি তার সেবায় খুশি হয়। যার চোখ আল্লাহেত শীতল হয়, তাকে দেখলে সকলেরই চোখ শীতল হয়'।

আরেকটি নিদর্শন হলোঃ তার যাবতীয় চিন্তা এক কথার ওপর আবর্তিত হবে। আর তা হলো, সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকা।

অনুরূপ অত্যন্ত কৃপণ লোক তার সম্পদের ওপর যতটুকু ব্যয়কুণ্ঠ হয়, সে তার চেয়েও নিজের সময়ের প্রতি যত্নশীল হবে- এটিও একটি আলামত।

তদ্রূপ একটি লক্ষণ হচ্ছে—যখন সে নামাজে দাঁড়ায়, তখন দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা ভাবনা তার থেকে দূরে ভেসে যায়। সে নামাযের মধ্যে শান্তি, প্রশান্তি, আরাম এবং আনন্দ খুঁজে পায়।

আরেকটি বড় আলামত হলো—সে অবিরাম তার রবের জিকির করতে করতে কখনো বিরক্ত হয় না। তাঁর সেবা করতে কখনো ত্যক্ত হয় না। তিনি ছাড়া অন্য কারও সাথে সখ্যতা গড়ে না; তবে যারা তাকে তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাঁর পথের দিশা দান করে, তাদের সাথেই

একমাত্র বন্ধুত্ব গড়ে তোলে।

আমল করার চেয়ে আমল শুদ্ধ করার প্রতি তার অধিক মনযোগী হওয়া। ইবাদতে ইখলাস অর্জন করার আগ্রহ, দ্বীনের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া, নিরবচ্ছিন্ন দ্বীনের ওপর অবিচলতা, দয়া ইত্যাদির প্রতি সচেষ্ট থাকা। যুগপৎ নিজের ওপর আল্লাহ্ তায়ালার অপার নিয়ামত এবং তাঁর প্রতি নিজের ত্রুটির কথা অকপটে স্বীকার করা ইত্যাদিও অন্তর সুস্থ হওয়ার অনবদ্য কিছু নিদর্শন।

অন্তরের রোগের কারণসমূহ

অন্তরের ওপর আপতিত বিপদ অনেক। তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে দুটি। ১- কামনা ও প্রবৃত্তি। ২-সংশয় ও সন্দেহ। প্রথমটি নিয়ত ও অভিলাষকে নষ্ট করে দেয়। আর দ্বিতীয়টি ইলম ও আকিদা-বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয়।

হুজাইফা বিন ইয়ামান রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'চাটাই বুননের মতো এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আপতিত হয়। যে অন্তরে তা গেঁথে যায়, সেখানে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করে, তার মধ্যে একটি সাদা দাগ পড়ে। তখন অন্তর দুই ধরণের হয়ে যায়। একটি হলো গাঢ় কালো উল্টানো সাদা মিশ্রিত কলসির ন্যায়; তার প্রবৃত্তির মধ্যে যা প্রবেশ করেছে তা ছাড়া ভালো-মন্দ কিছুই বুঝতে পারে না। আরেকটি অন্তর হলো শুভ্র অন্তর; যতদিন আসমান জমিন থাকবে, ততদিন সেখানে কোনো ফিতনা ক্ষতি করতে পারবে না।' [৮]

উক্ত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কলবকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক প্রকার হলো এমন কলব, যে কোনো ফিতনা তার ওপর আপতিত হলেই সে তা স্পঞ্জের ন্যায় চুষে নেয়। ফলে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। এভাবে সে একের পর ক্রমাগত ফিতনা চুষে

[৮] সহিহ মুসলিম ২৬৪

নিতে থাকে। এক পর্যায়ে তা গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে এবং উল্টে যায়। যেমন কলসি ভূপাতিত হয়ে উল্টে যায়। যখন তা কালো হয় এবং উল্টে যায়, তখন তার মধ্যে দুটি গুরুতর ভয়ংকর রোগ আক্রমণ করে, যা তাকেও ধ্বংসের বিবরে নিক্ষেপ করে। একটি রোগ হলোঃ সত্য ও ন্যায় তার কাছে সংশয়পূর্ণ হয়ে যায়। ফলে সে ভালো মন্দের মাঝে কোনো পার্থক্য করতে পারে না। আবার কখনো এই রোগ তার মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত হয় যে, সে সত্যকেই মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে থাকে। সুন্নতকে বিদআত, বিদআতকে সুন্নত; হককে বাতিল, বাতিলকে হক বলে নির্ধারণ করতে থাকে।

আর দ্বিতীয় রোগটি হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত শরীয়তের ওপর নিজের কামনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেয়। তাঁর অনুসরণের চেয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়।

কলবের দ্বিতীয় প্রকার হলোঃ শুভ্র সাদা একটি অন্তর। ঈমানের নূর সেখানে প্রজ্বলিত হয়। বিশ্বাসের বাতি তাকে করে দেয় আলোকিত। তাই কোনো ফিতনা তাকে আক্রমণ করতে চাইলে, কালবিলম্ব না করে সে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তাঁর উজ্জ্বলতা এবং আলো ক্রমান্বয়ে আরও প্রখর ও আভাময় হতে থাকে।

ক্বলবের চারটি বিষ

যাবতীয় গুনাহের কাজ কলবের জন্য বিষ স্বরূপ। তার অসুস্থতা এবং ধ্বংসের সোপান। গুনাহের কারণে অন্তরের রোগ প্রকট আকার ধারণ করে এবং আল্লাহ্ তায়ালার আদেশের বিপরীত কামনা বাসনায় ডুবে যায়। গুনাহ অসুস্থতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন—

'আমি গুনাহকে দেখেছি অন্তরসমূহকে নিষ্প্রাণ করে দেয়। গুনাহাসক্তির কারণে কখনো লাঞ্ছিতও হতে হয়।'

'গুনাহ পরিত্যাগ করা অন্তরের জন্য সঞ্জীবনী স্বরূপ। গুনাহ না করাই তোমার নিজের জন্য কল্যাণকর।'

সুতরাং যে চায়, নিজের অন্তর, নিজের জীবন নিরাপদ থাকুক, তার জন্য অপরিহার্য হলো, নিজের অন্তরকে এই বিষের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। পাশাপাশি নতুন কোনো বিষ যেন আক্রমণ না করতে পারে সেজন্য সদা সজাগ থাকা। আর যদি কদাচিৎ ভুলে একটু বিষ গলাধঃকরণ করেও নেয়, তখন তাওবা ইস্তিগফার এবং বিষ নষ্টকারী নেককাজ দ্বারা তার প্রভাব দূর করা আবশ্যক।

কলবের চারটি বিষ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—১- অতিরিক্ত কথা বলা। ২- অন্যায় দৃষ্টিক্ষেপ। ৩- অতিরিক্ত আহার এবং ৪- অতিরিক্ত মেলামেশা। এই চারটি বিষ অধিক প্রসিদ্ধ এবং কলবের জীবনে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে প্রতিটি আলাদা আলাদা একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

অতিরিক্ত কথা

আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> ‘কোনো ব্যক্তির ঈমান স্থির হবে না, যদি তার কলব স্থির না হয়। আর তার কলব স্থির হবে না, যদি না তার জিহ্বা স্থির হয়।’ [৯]

উক্ত হাদিসে ঈমানের স্থিরতাকে অন্তরের স্থিরতার সহিত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর অন্তরের স্থিরতার জন্য জিহ্বার স্থিরতাকে শর্ত করা হয়েছে। সুতরাং জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা এবং অতিরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

অন্য এক হাদিসে ইবনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—‘আল্লাহর জিকির ব্যতীত তোমরা বেশি কথা বলো না; কেননা আল্লাহর জিকির ছাড়া অধিক কথা বললে অন্তর কঠোর হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তায়ালা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে কঠোর হৃদয়ের লোকই।’

---

[৯] মুসনাদে আহমাদ ১৩০৪৮; তবরানি ১০৪০১

[১০] জামে’ তিরমিজি ২৪১১

উমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'যে বেশি কথা বলবে তার স্খলন হবে বেশি। যার স্খলন বেশি হবে, তার গুনাহ হবে বেশি। আর যার গুনাহ হবে বেশি, তার জন্য জাহান্নামের আগুনই অধিক উপযুক্ত।' [১১]

মুয়াজ রদিয়াল্লাহু আনহুর একটি দীর্ঘ হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> 'আমি কি তোমাকে সব কিছুর সার বলে দেবো না? মুয়াজ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসুলাল্লাহ। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জিহ্বা ধরে বললেন, 'এটি নিয়ন্ত্রিত রাখো'। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ, 'আমরা যে কথাবার্তা বলি, সেজন্যও কি আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে মুয়াজ, তোমার মা সন্তানহারা হোক! মানুষকে কেবল জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' [১২]

'জিহ্বার উপার্জন' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হারাম কথাবার্তার প্রতিদান ও শাস্তি। কেননা মানুষ তার কথাবার্তা দ্বারা সওয়াব এবং গুনাহের বীজ রোপণ করে। কেয়ামতের দিন এর ফসল কাটবে। সুতরাং যে ভালো কথা বা কাজ রোপণ করবে, সে সম্মান লাভ করবে। আর যে মন্দ কথা বা কাজ রোপণ করবে, সে পাবে অনুতাপ ও লজ্জা।

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'যে দুটি অঙ্গ মানুষকে বেশি পরিমাণ জাহান্নামে নিয়ে যাবে তা হলোঃ মুখ ও লজ্জাস্থান।'[১৩]

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১১] তাখরিজুল ইহইয়া, ইরাকী ৩/১৩৭; জামে সগির, সুয়ুতি ৮৯৭১
[১২] জামে তিরমিজি ২৬১৬; মুস্তাদরাক, হাকিম ২/৪১২
[১৩] জামে তিরমিজি ২০০৪

> ‘মানুষ এমন অনেক কথা বলে, যাকে সে কোনো অসুবিধা মনে করে না। অথচ এজন্য তাকে সত্তর বছর জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে।’[১৪]

উকবা বিন আমীর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, মুক্তি কোন পথে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> ‘নিজের জিহবাকে নিয়ন্ত্রণ করো। নিজের বাড়িতেই অবস্থান করো। নিজের গুনাহের জন্য ক্রন্দন করো।’[১৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> ‘যে ব্যক্তি তার দুই ঠোঁটের মাঝখানের বস্তু (জিহবা) ও দুই পায়ের মাঝখানের বস্তুর (লজ্জাস্থানের) জামিন হবে (অপব্যবহার করবে না), আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব।’ [১৬]

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখিরাতের দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।’ [১৭]

উক্ত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো কথা বলার আদেশ দিয়েছেন, অন্যথায় চুপ থাকতে বলেছেন। সুতরাং কথা হয়তো ভালো হবে, তাহলে বান্দা সে ব্যাপারে আদিষ্ট। আর যদি ভালো না হয়, তাহলে বান্দা সেক্ষেত্রে চুপ থাকতে আদিষ্ট।

উম্মে হাবিবা রদিয়াল্লাহু আনহা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> ‘মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য অপকারী, উপকারি নয়। তবে

[১৪] জামে তিরমিজি ২৩১৪; ইবনে মাজা ৩৯৭০

[১৫] তিরমিজি ২৪০৬; রিয়াদুস সালিহিন ১৫২৮

[১৬] সহিহ বুখারি ৬৪৭৪

[১৭] সহিহ বুখারি ৬০১৮

সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহ্ তায়ালার জিকির তার জন্য লাভদায়ক।' [১৮]

উমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু একবার আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন। দেখলেন, তিনি তাঁর হাত দিয়ে নিজ জিহ্বা টানছেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'থামুন, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন'। আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এর জন্যই যত বিপদ ঘটেছে'।' [১৯]

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ওই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমার জিহ্বা ছাড়া অন্য কোনো জিনিষের এতো অধিক দীর্ঘ কয়েদখানার প্রয়োজন নেই'।

তিনি বলতেন—'হে জিহ্বা, ভালো কথা বল, তাহলে লাভবান হবে। মন্দ কথা থেকে চুপ থাকো, তাহলে অপমানের হাত থেকে বেঁচে যাবে'।

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষের শরীরের কোনো অঙ্গ জিহ্বার চেয়ে অধিক ক্রুদ্ধ এবং রাগান্বিত হবে না। তবে যে তার দ্বারা ভালো কিছু বলেছে কিংবা কল্যাণকর কিছু লিখিয়েছে সে নিরাপদে থাকবে'।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন—'যে নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সে তার দ্বীনকেই অনুধাবন করতে পারে নি'।

জিহ্বার সবচেয়ে লঘু রোগ হলো অনর্থক কথা বলা। এই বিপদের ভয়াবহতা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে—

'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক যাবতীয় বিষয় পরিহার করা।'[২০]

আবু উবাইদা, হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'বান্দা থেকে আল্লাহ্ তায়ালার মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো,

[১৮] জামে তিরমিজি ২৪১২
[১৯] জামে সগির, সুয়ুতি ৫/৩৬৭; সহিহুত তারগিব, আলবানি ২৮৭৩
[২০] জামে তিরমিজি ২৩১৭; ইবনে মাজাহ ৩৯৭৬

বান্দার আল্লাহ্ তায়ালা থেকে গাফেল হয়ে অনর্থক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া'।

সাহল রহিমাহুল্লাহ বলেন—'যে অনর্থক কথা বলে, সে সত্য কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।'

এই যদি হয় জিহ্বার সবচেয়ে লঘু বিপদের ক্ষতির পরিমাণ, তাহলে গীবত, চোগলখুরি, অশ্লীল অন্যায় কথা, দুমুখো কথা, ঝগড়া, বিবাদ, বিতর্ক, গান গাওয়া, মিথ্যা বলা, অযথা তারিফ করা, ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, অধিকাংশ কথায় ভুল করা ইত্যাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিপদের ক্ষতি কী পরিমাণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়! এসব বিপদ ব্যক্তির জিহবায় আপতিত হয়ে তার অন্তরকে নষ্ট করে দেয়। ফলে দুনিয়ার সুখ শান্তি বিনষ্ট হয় এবং আখিরাতের সফলতা ও নিষ্কৃতির হয়ে যায় বিনাশসাধন। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমিন।

অন্যায় দৃষ্টিপাত

অন্যায় দৃষ্টিপাত দ্বারা কোনো জিনিষের সৌন্দর্য অন্তরে প্রবেশ করে। দর্শকের অন্তরে জায়গা করে নেয় দৃষ্ট জিনিষের একটি অবয়ব। ফলে উৎপাদন হওয়া শুরু হয় অন্তরে পচন সৃষ্টির অনেক উপাদান। নিম্নে তার মধ্য থেকে কিছু উল্লেখ করা হলো—

১- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'দৃষ্টি শয়তানের একটি বিষাক্ত তির। সুতরাং যে আল্লাহর ভয়ে নিজের চোখকে সংযত রাখবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার অন্তরে একটি (অপার্থিব) আনন্দ সৃষ্টি করে দেবেন। কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সে তা উপভোগ করবে।' [২১]

২- দৃষ্টির চোরাপথ দিয়ে শয়তান প্রবেশ করে। উন্মুক্ত প্রান্তরে বাতাস যত দ্রুত প্রবেশ করে, শয়তান তার চেয়ে দ্রুত গতিতে দৃষ্টিপথে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। দৃষ্টের আকৃতিকে রমণীয় করে উপস্থাপন করে এবং তাকে বানিয়ে দেয় একটি মূর্তি; কলব যার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে যায়।

---

[২১] মুসতাদরাক, হাকিম ৪/৩১৪; মুসনাদ, আহমদ ৫/২৬৪

অতঃপর তাকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি, আশা ও ভরসা দেয়। এভাবে তার অন্তরে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং উস্কে দেয় গুনাহের ইন্ধন; যদি দৃষ্টির মাধ্যমে ওই আকৃতি তার মনে প্রবেশ না করতো, তাহলে এসব কিছুই হতো না।

৩- দৃষ্টির অবাধ ব্যবহার অন্তরকে উদাসীন করে দেয়। সে তার কল্যাণকর বিষয়গুলো ভুলে যায়। মঙ্গল এবং কলবের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই অন্তর শিথিল হয়ে পড়ে এবং উদাসীনতা ও প্রবৃত্তির খাঁদে পড়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

> 'এমন লোকের আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজই হচ্ছে সীমা লঙ্ঘন করা।'[২২]

দৃষ্টির কারণে আয়াতে বর্ণিত তিনটি অনর্থ সৃষ্টি হয়।

হৃদ-বিশেষজ্ঞরা বলেন, চোখ এবং অন্তরের মাঝে একটি পথ এবং জানালা আছে। তাই যখন চোখ নষ্ট এবং বিকৃত হয়ে যায়, অন্তরও নষ্ট এবং বিকৃত হয়ে যায়। তখন তা পরিণত হয় একটি ডাস্টবিনে; যেখানে সমস্ত নাপাকি, ময়লা এবং আবর্জনা নিক্ষেপিত হয়। ফলে সেখানে আর আল্লাহ্ তায়ালার মারেফাত, ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর নৈকট্যে আনন্দিত হওয়া ইত্যাদি অবস্থান করার যোগ্য থাকে না। তখন অন্তর পরিণত হয় এসবের বিপরীত জিনিসের বাসস্থানে ।

৪- দৃষ্টিক্ষেপের কারণে আল্লাহর অবাধ্যতা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন—

> 'মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করে। এটি তাদের পবিত্র থাকার জন্য অধিক সহায়ক। তারা যা কিছু করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।'[২৩]

---

[২২] সুরা কাহফ ২৮

[২৩] সুরা নূর ৩০

দুনিয়ায় আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ মান্য না করে কেউ সুখী হতে পারে না। অনুরূপ আখিরাতেও বান্দার মুক্তির কোনো উপায় নেই আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ মানা ব্যতীত।

৫- দৃষ্টির মাধ্যমে অন্তরে অন্ধকারের আবরণ পড়ে যায়। অনুরূপ দৃষ্টিকে আল্লাহ তায়ালার জন্য হেফাজত করলে, আল্লাহ্ তায়ালা তাতে নুরের আভা ছড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পূর্বোক্ত আদেশ, দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ (সুরা নূর ৩০), এর পরেই উল্লেখ করেছেন নুরের আয়াত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

> 'আল্লাহ্ আসমান জমিনের নূর। তাঁর নুরের উপমা হলো যেন একটি দীপাধার, যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ।'[২৪]

আর যখন অন্তর আলোকিত হয়ে যায়, তখন চতুর্দিক থেকে কল্যাণের দূতেরা তার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। তদ্রূপ যখন তা অন্ধকারে পরিণত হয়, তখন সর্বস্থান থেকে বিপদ ও অনিষ্টের মন্দ ছায়া তার দিকে লালায়িত হতে থাকে।

৬- দৃষ্টিক্ষেপের কারণে অন্তর তার সত্য-মিথ্যা, সুন্নাহ-বিদআতের মাঝে পার্থক্য করার নির্ণয়ী শক্তি হারিয়ে ফেলে। কেমন যেন সে অন্ধ হয়ে যায়। আর যদি তা আল্লাহর জন্য অবনত রাখা হয় এবং হেফাজত করা হয়, তাহলে সেখানে সত্যের একটি আলোক তৈরি হয়, যার দ্বারা হক-বাতিল ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হয়ে যায়।

আল্লাহর একজন নেককার বান্দা বলেছিলেন—'যে নিজের বাহ্যকে সুন্নাহর অনুসরণ দিয়ে এবং অভ্যন্তরকে অবিরত ধ্যানমগ্নতা দিয়ে গড়ে তুলবে, নিজের চোখকে হেফাজত করবে হারাম থেকে, অন্তরকে নিবৃত্ত রাখবে সংশয় থেকে এবং হালাল খাবার ভক্ষন করবে, সে অবশ্যই ফিরাসাহ তথা খোদাপ্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করবে।'

যে ব্যক্তি নিজের চোখকে আল্লাহ্ তায়ালার নিষিদ্ধ বস্তু থেকে হেফাজত করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার অন্তরে অন্তর্দৃষ্টি ঢেলে দেবেন।

---

[২৪] সুরা নূর ৩৫

স্বল্প খাবার খেলে অন্তর দয়ার্দ্র হয়, মেধাশক্তি প্রখর হয়, ক্রোধ এবং প্রবৃত্তি দুর্বল হয়। পক্ষান্তরে অধিক খাবার খেলে এর বিপরীত ফলাফল প্রকাশ পায়।

মিকদাম বিন মা'দিকারাব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

> 'মানুষ তার উদরের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো ভাণ্ড ভরে না। আদম সন্তানের জন্য এমন কিছু লোকমাই যথেষ্ট যা তার মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে। আর যদি এর চেয়ে অধিক খেতেই হয়, তাহলে এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য।' [২৫]

অতিরিক্ত ভক্ষণ অনেকগুলো অনিষ্টের জন্য দায়ী। তা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গোনাহের জন্য প্রলুব্ধ করে, ইবাদত এবং শারীরিক সওয়াবের কাজ থেকে ভারী করে দেয়; খারাবি বর্ণনা করার জন্য এই দুটিই যথেষ্ট। কতো গুনাহ এমন রয়েছে, যার মূল কারণ উদরপূর্তি এবং অতিরিক্ত ভক্ষণ! আবার এদুইয়ের কারণেই কতো শত ইবাদত বাঁধাগ্রস্ত হয়ে যায়। বস্তুত যে নিজের উদরের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ, সে তো বিশাল এক ক্ষতি থেকে নিরাপদ। আর শয়তান মানুষকে খুব সহজেই ঘায়েল করতে পারে তখন, যখন তার পেট খাবার দ্বারা পূর্ণ থাকে। এজন্যই জনৈক বিজ্ঞ লোক বলেছিলেন, 'তোমরা রোজা রেখে শয়তানের গতিপথ সংকীর্ণ করে দাও'।

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'বনী ইসরাইলের কিছু যুবক একত্রে উপাসনা করতো। যখন তাদের খাবারের সময় হতো, তখন একজন তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলত, "তোমরা বেশি আহার করো না; তাহলে বেশি পান করতে হবে। ফলে অধিক নিদ্রা আগমন করবে আর তোমরা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে'।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম

[২৫] জামে তিরমিজি ২৩৮০; ইবনে মাজাহ ৩৩৪৯

অধিকাংশ সময় ক্ষুধার্ত থাকতেন। এটি যদিও খাবারের অনুপস্থিতির কারণে ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসুলের জন্য সর্বোত্তম এবং পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থাই নির্বাচন করেছিলেন। আর এ জন্যই ইবনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা খাবারের সক্ষমতা থাকতেও এই সুন্নাহর অনুসরণ করতেন। তাঁর পূর্বে তাঁর পিতা উমর রদিয়াল্লাহু আনহুও একই পথ মাড়িয়ে গেছেন। আম্মাজান আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'মদিনায় আগমনের পর থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার এক নাগাড়ে তিন রাত গমের রুটি পেট পুরে খাননি।'[২৬]

ইবরাহিম বিন আদহাম রহিমাহুল্লাহ বলেন—'যে নিজের পেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সে নিজের দ্বীনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। যে নিজের ক্ষুধাকে সংবরণ করতে পারবে, যে সমস্ত উত্তম চরিত্র অধিকার করতে পারবে। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতা ক্ষুধার্ত থেকে যোজন যোজন দূরে, পরিতৃপ্তের অনেক নিকটে।'

অতিরিক্ত সংযোগ রক্ষা

এটি একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। সমস্ত অনিষ্টের আকর্ষক শক্তি। মানুষের সাথে অধিক মেলামেশা ও সংযোগের কারণে কত নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যায়, রোপিত হয় কত শত্রুতার চাড়া এবং অন্তরে স্থাপিত হয় এমন স্থির বিদ্বেষ, পাহাড় তার আপন স্থান থেকে সরে গেলেও তা অন্তরে নিজ স্থানে অটল থাকে। বস্তুত অতিরিক্ত মেলামেশা এবং সংযোগে দুনিয়ারও ক্ষতি নিহিত, আখিরাতেরও ক্ষতি নিহিত।

ব্যক্তির উচিত মানুষের সাথে ওই পর্যন্ত মেলামেশা করা, যতক্ষণ তা উপকারি থাকে। এজন্য মানুষকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যখন এক ভাগ অন্য ভাগের সাথে মিশ্রিত হয় এবং সেখানে কোনো পার্থক্য রেখা থাকে না, তখনই সেখানে অনিষ্ট সৃষ্টি হয়।

১-কিছু মানুষের সঙ্গ হচ্ছে খাবারের ন্যায়; দিবারাত্রি যে কোনো সময়

[২৬] সহিহ বুখারি ৫৪১৬; সহিহ মুসলিম ২৯৭০

প্রয়োজন হতে পারে। যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, তখন তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে। আবার যখন সাহচর্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে, তখন আবার তাদের সংস্পর্শে আসবে- খাবারের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রযোজ্য হলেও এই শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে তা একদমই প্রযোজ্য নয়; বরং তাদের সঙ্গ অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলতে থাকবে। তারা হলেন ওই সমস্ত মানুষ, যারা আল্লাহকে চেনেন, তাঁর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানেন, তাঁর শত্রুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত আছেন, অন্তরের রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ্, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসুল ও তাঁর সৃষ্টির জন্য শুভার্থী। এই প্রকারের মানুষের সঙ্গ নিয়ে আসে লাভের ওপর লাভ।

২-কিছু মানুষের সঙ্গ ঔষধের ন্যায়; রোগ হলে তাদের প্রয়োজন হয়। অতএব আপনি যখন সুস্থ থাকবেন, তখন তাদের সংস্পর্শের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা হলেন ওই সমস্ত লোক, জীবন ধারনের জন্য, ব্যবসা বানিজ্য পরামর্শ ইত্যাদি করার জন্য যাদের সাথে সংযোগ রাখা অপরিহার্য। সুতরাং যখন তাদের থেকে প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে, তখন অবশ্যই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।

৩-অনেক মানুষ আছে যাদের সঙ্গ, তাদের প্রকার স্তর শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার তারতম্যে, রোগের ন্যায়। তাদের মধ্যে কিছু আছে, যাদের সঙ্গ দুরারোগ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগের ন্যায়। তারা হলো ওই সমস্ত লোক, যাদের থেকে দুনিয়া যুগপৎ আখিরাতের কোনো লাভ অর্জন হয় না। এরকম মানুষের সঙ্গ যদি আপনাকে পেয়ে বসে এবং তা অব্যহত থাকে, তাহলে তা আপনার জন্য মরণ ব্যাধিতে পরিণত হবে।

অন্যদিকে কিছু লোক আছে, যারা ভালো করে কথা বলতে পারে না যে আপনি তার থেকে উপকৃত হবেন; চুপও থাকতে পারে না যে আপনার থেকে তারা উপকৃত হবে; সে নিজের স্তর জানে না যে সেখানে নিজেকে স্থাপিত করবে। বরং সে যখন কথা বলে, তখন তার বাক্যবাণ হয় বিদ্রোহীর মতো, শ্রোতাদের অন্তরে যা বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক ঘটায়। সে যখনই সুযোগ পায়, তখনই এমন ওজস্বী কথা বলে আর ধারণা করতে থাকে যে, সে মজলিসকে অমোঘ এক সুরভী দ্বারা সুরভিত করে ফেলেছে। কিন্তু যখন

সে কথা বলা থামিয়ে দেয়, চুপ হয়ে যায়, তখন প্রস্ফুটিত হয় যে, সে ছিল জাঁতার বিরাট এক কলের ন্যায়; যাকে বহন করাও সম্ভব নয় আবার জমিনে রেখে টেনে নেওয়াও সম্ভব নয়; তার বাক্যবাণ পুরোটাই নিষ্ফল।

এমন অপোগণ্ড লোকের সংস্পর্শ দুধরণের হতে পারে। আবশ্যিক এবং আকস্মিক। আকস্মিক হলে তো তা এড়িয়ে যেতে সময় লাগে না। কিন্তু যদি ভাগ্যের পরিহাসে কেউ এমন কারও পাল্লায় পড়ে যায়, তার সাথে মেলামেশা করা ছাড়াও কোনো গতি না থাকে, তাহলে সে যেন উত্তমভাবে তার সাথে মেলামেশা করে; বাহ্য দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখে কিন্তু অভ্যন্তরকে তার থেকে নিরাপদে রাখে, যতদিন না আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য মুক্তির কোনো পথ বা পন্থা বের করে দেন।

৪- কিছু মানুষ আছে যাদের সংশ্রব ধ্বংসের নামান্তর। কেমন যেন নিজ হাতে বিষ পান করা। অতঃপর যদি বরাত সুপ্রসন্ন হয়, তাহলে প্রতিষেধক পাওয়া যায়। অন্যথায় তার জন্য বিলাপ করা ছাড়া কোনো গতি নেই। এ প্রকারের মানুষের সংখ্যাই অধিক। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করুন। তারা হলো বিদআত এবং ভ্রষ্টতা চর্চাকারী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ উপেক্ষাকারী, অনিসলামের দিকে আহ্বানকারী, সুন্নতকে বিদআত আর বিদআতকে সুন্নত সাব্যস্তকারী। কোনো বুদ্ধিমান ধীসম্পন্ন ব্যক্তি এমন লোকদের সংস্পর্শে যেতে পারে না, তাদের সাথে মেলামেশা করতে পারে না। খোদা না করুন, যদি করেই ফেলে, তাহলে তার অন্তরের জন্য মৃত্যু কিংবা অসুস্থতা অপরিহার্য।

আমরা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে নিজেদের এবং তাদের জন্য রহমত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

ক্বলবের সঞ্জীবনী এবং উপাদেয় আহারাদি

মানুষের শরীরের গঠন ঠিক রাখার জন্য যেমন পানাহার অপরিহার্য, তেমনি ব্যক্তির অন্তর জীবিত রাখার জন্য ইবাদত এবং সওয়াবের কাজ করা জরুরী। সমস্ত গুনাহ অন্তরের জন্য বিষাক্ত খাবারের ন্যায়। বান্দা তার রবের ইবাদত করার মুখাপেক্ষী, জাতিগতভাবেই তাঁর ওপর নির্ভরশীল।

ব্যক্তি যেমন নিজের শরীরকে প্রাণবন্ত রাখতে নির্দিষ্ট সময় পরপর উপকারী খাবার ভক্ষণ করে, আবার কখনো যদি দেখা যায় যে, ভুলক্রমে বিষযুক্ত খাবার খেয়ে ফেলেছে, তখন নিজের শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে- ঠিক তেমনি বান্দার অন্তর তার শরীরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের জীবন যদি তাকে দুনিয়ায় সুস্থ জঞ্জালমুক্ত একটি জীবন যাপন করার জন্য যোগ্য করে তোলে, তাহলে অন্তরের জীবন তাকে দুনিয়ায় একটি পবিত্র পরিচ্ছন্ন এবং আখেরাতে অফুরন্ত সুখের জীবনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। তদ্রূপ শরীরে মৃত্যু যেমন তাকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তেমনি অন্তরের মৃত্যু চিরজীবন তার জন্য অসুখ অশান্তিকে অবশিষ্ট রাখে।

আল্লাহ্ তায়ালার একজন সৎ বান্দা বলেছেন—'মানুষের জন্য বিস্ময় জাগে, কারও শরীর মারা গেলে তারা তার জন্য বিলাপ করে। কিন্তু কারও অন্তর মারা গেলে তার জন্য বিলাপ করে না। অথচ অন্তরের মৃত্যুই অধিক কষ্টদায়ক'।

অতএব অন্তরের জীবনের জন্য ইবাদত এবং সওয়াবের কাজ করা আবশ্যক। বান্দার কলবের জীবন এবং তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নিম্নে কিছু কার্যকরী ভালো কাজের কথা উল্লেখ করছি। ঈষৎ বিস্তারিত। সেগুলো হলোঃ আল্লাহ্ তায়ালার জিকির, কুরআন তিলাওয়াত, ইসতিগফার, দোয়া, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ এবং কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের নামায।

আল্লাহর জিকির ও কুরআন তিলাওয়াত

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ কলবের জন্য জিকিরের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন—'অন্তরের জন্য জিকির তেমন, মাছের জন্য পানি যেমন। মাছকে যদি পানি থেকে বের করে ফেলা হয় তাহলে তার কী অবস্থা হবে!'

শামসুদ্দিন ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাব 'আল ওয়াবিলুস সাইয়িব'-এ এই বিষয়ে প্রায় আশিটি ফায়েদা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ চাহে তো আমরা এখানে তার মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করব। যেহেতু তা মূল্যবান এবং উপকারী, তাই আমরা হুবহু ওই কিতাব থেকেই তা উদ্ধৃত করছি।

'জিকির হলো কলব এবং রূহের খোরাক। মানুষের শরীরের খোরাক বন্ধ করে দিলে তার যে অবস্থা হয়, জিকির না করলে অন্তরের অবস্থাও তেমন বিপন্ন হয়'।

'জিকির শয়তানকে বিতাড়িত করে, দমন করে এবং বশীভূত করে। আল্লাহ্ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করে। অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে এবং খুশি আনন্দ ও প্রশান্তির যোগান দেয়। অন্তর এবং চেহারাকে আলোকিত করে। জিকিরকারীর মাঝে গাম্ভীর্য, সজিবতা ও মিষ্টতা তৈরি হয়। অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা, ভয় এবং তাঁর প্রতি বিনয় জন্ম নেয় । অনুরূপ বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার জিকির করলে আল্লাহ্ তায়ালাও বান্দাকে স্মরণ করেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব।'[১]

জিকিরের মাঝে যদি অন্য কোনো উপকারিতা কিংবা পাওনা না থাকতো, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাকে স্মরণ করেন এই একটি বিষয়ই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট।

জিকির কলবকে উদাসীনতা থেকে পুনরজাগরিত করে এবং গুনাহগুলো মিটিয়ে দেয়।

জিকির যদিও খুবই সহজ একটি ইবাদত, তথাপি তার জন্য যে পরিমাণ প্রতিদান ও মর্যাদা বরাদ্ধ করা হয়েছে, অন্য কোনো আমলের জন্য তা বরাদ্ধ করা হয় নি। আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আল্লা কুল্লি শাইইন কাদির' দিনে একশ বার পাঠ করবে, সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে। তাঁর জন্য একশটি সওয়াব লেখা হবে। তার একশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। ওইদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। কোনো ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম কোনো আমল করতে পারবে না, তবে যে তার চেয়ে অধিক পাঠ করবে সে পারবে।'[২]

জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> 'যে ব্যক্তি বলবে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি—তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।'[৩]

[১] সুরা বাকারা ১৫২
[২] সহিহ বুখারি ৩২৯৩
[৩] জামে তিরমিজি ৩৪৬৫

ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'আমার কাছে আল্লাহর জন্য সহস্র তাসবিহ পাঠ করা, আল্লাহর রাস্তায় সে পরিমাণ দীনার ব্যয় করা থেকে অধিক প্রিয়।

জিকির অন্তরের রুঢ়তার ঔষধ। এক ব্যক্তি হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহকে বলল, হে আবু সাইদ, আমার অন্তর অনেক রুঢ়। আপনি কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। তিনি বললেন, 'তাকে জিকির দ্বারা সিক্ত করো।

মাকহুল রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার জিকির একটি প্রতিষেধক আর মানুষের জিকির একটি ব্যাধি।

এক ব্যক্তি সালমান রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করল—'কোন আমলটি সবচেয়ে বেশি উত্তম। তিন বললেন—'তুমি কি কোরআন পাঠ করো না! 'আল্লাহর জিকিরই সবচেয়ে উত্তম'।

আবু মুসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> 'যে স্বীয় রবের জিকির করে আর যে করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত এবং মৃত।' [৪]

আবদুল্লাহ বিন বুসর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার জন্য ইসলামের শরীয়তের বিষয়াদি অধিক হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমি শক্ত করে ধরে রাখতে পারি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> 'তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার জিকির দ্বারা সিক্ত থাকে।' [৫]

সর্বদা জিকির করার দ্বারা কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সাক্ষী বৃদ্ধি পায়। গীবত চোগলখুরি ইত্যাদি অন্যায় কথা থেকে বান্দা নিজের জিহ্বাকে হেফাজত করতে পারে। বান্দার জিহ্বা হয়তো জিকিরকারি হবে, অন্যথায়

---

[৪] সহিহ বুখারি ৬৪০৭

[৫] জামে তিরমিজি ৩৩৭৫

অনর্থক হবে। সুতরাং যার জন্য জিকিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে, সে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে যাওয়ার দরজা খোলা পাবে। সে যেন পবিত্র হয়ে তার রবের দরবারে প্রবেশ করে; তাহলে তাঁর কাছে কাঙ্ক্ষিত সবকিছুই পাবে। যদি বান্দা নিজের রবকে পেয়ে যায়, তাহলে সবকিছু পেয়ে যাবে। আর যদি স্বীয় রবকে হারিয়ে বসে, তাহলে সে সবকিছু থেকে বঞ্চিত থাকবে'।

জিকিরের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার নাম, গুণাবলী, প্রশংসা এবং তার স্তুতি গেয়ে জিকির করা। যেমন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তায়ালার নাম ও গুণাবলীর হুকুম আহকাম বর্ণনা করাও জিকিরের একটি ধরণ। যেমন, এই কথা বলা যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের আওয়াজ শুনেন এবং তাদের যাবতীয় কার্যাবলী দেখেন।

জিকিরের আরেকটি ধরণ হলো, আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ নিষেধের কথা স্মরণ করা ও আলোচনা করা। যেমন বলবে, আল্লাহ্ তায়ালা অমুক কাজের আদেশ দিয়েছেন, এই কাজে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা আছে—

আল্লাহ্ তায়ালার দয়া ও নিয়ামতসমূহের আলোচনা করাও জিকিরের একটি ধরণ। সর্বোত্তম জিকির হলো কুরআন তিলাওয়াত করা। কেননা সেখানে অন্তরের সমস্ত রোগ এবং তা প্রতিকারের পন্থা উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ

'হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশবাণী এবং অন্তরের ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা।' [৬]

অন্যত্র বলেন—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

[৬] সুরা ইউনুস ৫৭

> 'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য এবংঅনুগ্রহ।'[৭]

কামনা বাসনা এবং সংশয় সন্দেহও কলবের রোগের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন এই প্রকার রোগেরও চিকিৎসা করে। কুরআনে এমন স্পষ্ট দলিল প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, যা সত্য থেকে মিথ্যাকে পৃথক করে দেয়। ফলে বিশ্বাস, কল্পনা এবং অনুভূতি-বিনষ্টকারী সংশয়গুলো দূর হয়ে যায়। তখন সে কুরআনের দৃষ্টিতে সব জিনিষ প্রত্যক্ষ্য করে।

অতএব যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং অন্তর দিয়ে অবগাহন করবে তার সরোবরে, সে সত্য ও মিথ্যা অনুধাবন করতে পারবে। দিন ও রাতের মাঝে যেমন পার্থক্য করতে পারে, হক বাতিলের মাঝেও তেমন পার্থক্য নিরুপণ করতে পারবে।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত প্রজ্ঞাবাণী এবং উৎকৃষ্ট উপদেশগুলো পাঠ করবে, দুনিয়াবিমুখী এবং আখিরাতমুখী আয়াতগুলো আত্মস্থ করবে, তার অন্তরের প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার ব্যাধিও সুস্থ হয়ে যাবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'যে চায় আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল তাকে ভালবাসুক, যে যেন কুরআন পাঠকরে।' [৮]

কুরআন দ্বারাই বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটে পৌঁছতে পারে। খাব্বাব বিন আরাত্ত রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'যতো পারো আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভ করো। আর জেনে রাখো, তাঁর কালামের চেয়ে প্রিয় কোনো মাধ্যমে তুমি তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে না'।

ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'যে কুরআনকে ভালোবাসে, সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে।'

উসমান বিন আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'তোমাদের অন্তর যদি

[৭] সুরা ইউনুস ৫৭
[৮] শুয়াবুল ঈমান, বাইহাকি ২২১৯; সিলসিলাহ সহিহা ২৩৪২

পবিত্র হয়ে যায়, তবুও তোমাদের রবের কালাম থেকে তা পরিতৃপ্ত হবে না'।

পরিশেষে আমরা বলব, বান্দার জন্য সবচেয়ে উপকারী উপাদান হলো আল্লাহ্ তায়ালার জিকির করা এবং কুরআন তিলাওয়াত হলো আল্লাহ্ তায়ালার সবচেয়ে উন্নত জিকির। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

। শুনে রাখো, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।[৯] ।

[৯] সূরা রাদ ২৮

ইস্তিগফার

ইস্তিগফারের শাব্দিক অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। ক্ষমা প্রার্থনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গুনাহ গোপন করত তার অভিশাপ ও আজাব থেকে নিরাপত্তা এবং রক্ষা করার আবেদন করা। কুরআনে কারিমে ইস্তিগফারের আলোচনা এসেছে অনেক বার। কখনো আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ দিয়ে বলেছেন—

وَ اسْتَغْفِرُوا اللهَ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

> 'তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমাশীল এবং দয়াবান।'[১]

আবার কখনো ইস্তিগফারকারীদের প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা প্রশংসিত বান্দাদের ফিরিস্তি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—

وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

> 'এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।'[২]

যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

[১] সুরা বাকারা ১৯৯

[২] সুরা আলে ইমরান ১৭

> 'যে কোনো মন্দ কাজ করে কিংবা নিজের ওপর জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহেক ক্ষমাশীল এবং দয়াবান পাবে'। [৩]

আবার অনেক স্থানে ইস্তিগফারকে তাওবার সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। তখন ইস্তিগফারের অর্থ হবে মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা। অন্তর যুগপৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা গুনাহ পরিহার করা, এরই নাম তাওবা।

ইস্তিগফারের হুকুম এবং দোয়ার হুকুম অভিন্ন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা চাইলে তার আবেদন রক্ষা করে তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বিশেষত যখন গুনাহের ভারে ন্যূজ কোনো হৃদয় থেকে সে আহ্বান প্রস্ফুটিত হয় কিংবা শেষ রাত, সালাত-পরবর্তী সময় ইত্যাদি গুনাহ কবুল হওয়ার সময়গুলোতে দোয়া করা হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালা অধিক হারে তা গ্রহণ করেন।

লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে সম্বোধন করে বলেছেন—'হে আমার ছেলে, 'আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিন' এই কথা দ্বারা তোমার জিহ্বাকে অভ্যস্ত করে নাও। কেননা আল্লাহ্ তায়ালার এমন কিছু সময় আছে, যখন তিনি কোনো ভিখারিকেই খালি হাতে ফেরান না'।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন—'তোমরা তোমাদের ঘরে, দস্তরখানে, পথেঘাটে, বাজারে, আসরে এবং যেখানেই থাকো বেশি বেশি ইস্তিগফার করো। কেননা কখন ক্ষমা নাযিল হয় তা তোমাদের জানা নেই।'

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'আল্লাহর শপথ, আমি দিনে সত্তর বারের চেয়েও অধিক আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তাওবা ইস্তিগফার করি।' [৪]

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

---

[৩] সুরা নিসা ১১০

[৪] সহিহ বুখারি ৬৩০৭

'এক বান্দা গোনাহ করে। তারপর সে বলে, হে আমার রব, আমি একটি গুনাহ করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন তার রব বলেন, আমার বান্দা কি এ কথা বিশ্বাস করে যে, তার একজন রব আছে, তিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর ওই বান্দা কিছুকাল আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে আবারও একটি গুনাহ করে। এরপর সে বলে, হে আমার রব, আমি আবারও গুনাহ করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তার রব তখন বলেন, আমার বান্দা কি এ কথা বিশ্বাস যে, তার একজন রব আছেন, তিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর ওই বান্দা কিছুকাল আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে আবারও একটি গুনাহ করে। এরপর সে বলে, হে আমার রব, আমি আবারও গুনাহ করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তার রব তখন বলেন, আমার বান্দা কি এ কথা বিশ্বাস যে, তার একজন রব আছেন, তিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন? এরপর তিনি তিনবার বলেন, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা ইচ্ছা করুক।' [৫]

'সে যা ইচ্ছা করুক' অর্থাৎ যতদিন সে গুনাহ করে ইস্তিগফার করার এই অবস্থায় বহাল থাকবে, ততদিন আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা কবুল করতে থাকবেন। তবে এখানে ইস্তিগফার দ্বারা এমন ইস্তিগফার উদ্দেশ্য, যার সাথে গুনাহ একেবারে পরিহার করা এবং পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প থাকবে।

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—'সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে নিজ আমলনামায় প্রচুর ইস্তিগফার পাবে।'

অতএব এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, গুনাহের ঔষধ হলো ইস্তিগফার।

কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন—'এই কুরআন তোমাদেরকে তোমাদের রোগ এবং ঔষধ উভয়টি দেখিয়ে দিয়েছে। তোমাদের রোগ হলো গুনাহ। আর

[৫] সহিহ বুখারি ৭৫০৭

ঔষধ হলো ইস্তিগফার'।

আলী রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'আল্লাহ্ তায়ালা যে বান্দাকে আজাব দিতে চান, তাকে ইস্তিগফারের তাওফিক দেন না'।

দোয়া

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

> 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' [১]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন এবং আমাদের দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরপর বলেছেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

> 'যারা আমার দাসত্ব থেকে বিমুখ থাকবে অহংকারবশত, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' [২]

আল্লাহ্ তায়ালা কতই না মহান! কতই ব্যাপক তাঁর দয়া! তিনি কতই না উদার! বান্দাদের নিজের প্রয়োজন পূরণে, নিজের কামনা পূরণের জন্য তাঁকে প্রার্থনা করাকে তাঁর ইবাদত বানিয়ে দিয়েছেন। উপরন্তু বান্দাকে চাইতে আদেশ করেছেন। অধিকন্তু অহংকারবশত বিরত থাকলে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন।

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে

---

[১] সুরা গাফির ৬০

[২] সুরা গাফরি ৬০

বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন—

> ‘যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ্ তার ওপর রাগান্বিত হন।’ [৩]

জনৈক ব্যক্তি কতো সুন্দর বলেছেন, ‘মানুষের কাছে নিজের প্রয়োজন চেয়ো না; বরং চাও ওই সত্ত্বার কাছে যার দরজা কখনো বন্ধ হয় না। আল্লাহ্ তায়ালা ক্রোধান্বিত হন যদি তাঁর কাছে না চাও; মানুষের কাছে চাইলে সে নারাজ হয়’।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ

> ‘যখন আর্ত ডাক দেয়, কে তার ডাকে সাড়া দেন এবং বিপদ দূর করেন?’ [৪]

অন্যত্র বলেন—

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

> ‘যখন আমার বান্দারা আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে, আপনি তাদের বলুন, আমি নিকটেই আছি। প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে।’ [৫]

নুমান বিন বশির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> ‘দোয়াই হলো ইবাদত।’

অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেছেন—‘তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।

---

[৩] জামে তিরমিজি ৩৩৭৩
[৪] সুরা নামল ৬২
[৫] সুরা বাকারা ১৮৬

নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিরত থাকে, অতিশীঘ্রই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' [৬]

দোয়া অবশ্যই গৃহীত হয়, উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে তাই স্পষ্ট। নিম্নোক্ত হাদিসগুলোও এ কথার প্রমাণ বহন করে। তবে দোয়া তখনই কবুল হয়, যখন তার সমস্ত শর্ত পাওয়া যায়।

সালমান ফারসি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং উদার। কেউ তাঁর দরবারে দুই হাত তুললে তিনি তাকে খালি হাতে ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।'[৭]

আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমরা দোয়া করা থেকে নিবৃত্ত হইয়ো না। কেননা দোয়া করতে থাকলে কেউ ধ্বংস হয় না'। [৮]

আবু সাইদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'কোনো মুসলমান যদি এমন দোয়া করে, যা কোনো গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি করে না, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে তিনটির একটি প্রতিদান দান করেনঃ ১- হয়তো তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দুনিয়াতে দিয়ে দেন। ২- অথবা আখিরাতের জন্য তা সঞ্চয় করে রাখেন। ৩- অথবা তার পরিবর্তে কোনো বিপদ দূর করে দেন।' [৯]

উমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন—'আমি দোয়া কবুল হওয়ার চিন্তা করি না; বরং দোয়া করতে পারার জন্য চিন্তা

[৬] জামে তিরমিজি ২৯৬৯
[৭] জামে তিরমিজি ৩৫৫৬
[৮] মুসতাদরাক, হাকিম ১/৪৯৩
[৯] মুসনাদ, আহমদ ১১১৩৩; মিশকাতুল মাসাবিহ ২২৫৯

করি। কেননা যাকে দোয়া করার তাওফিক দেওয়া হয়, সাড়া তার নিকটেই থাকে।'

দোয়ার আদব ও শর্তসমূহ

১- দোয়ার জন্য পবিত্র সময়গুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া। যেমন, আরাফার দিন, রমজান মাস, জুমার দিন, রাতের শেষ অংশ ইত্যাদি।

২- সম্মানজনক অবস্থা ও মুহূর্তগুলো কাজে লাগানো। যেমন, বৃষ্টি অবতীর্ণ হওয়ার সময়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সময়, সিজদার সময় ইত্যাদি।

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'বান্দা যখন সিজদারত অবস্থায় থাকে, তখন সে তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থানে থাকে। তাই তোমরা বেশি বেশি দোয়া করো।'[১০]

আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়েও দোয়া কবুল হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'আজান ও ইকামতের মাঝে কৃত দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না'।[১১]

৩- দৃঢ়ভাবে দোয়া করা এবং কবুল হওয়ার বিশ্বাস রাখা। আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে—'হে আল্লাহ্, আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্, আপনি চাইলে আমাকে রহম করুন"। বরং তোমরা দৃঢ়ভাবে দোয়া করবে; কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই'।[১২]

৪- পবিত্র অবস্থায়, কিবলামুখী হয়ে তিনবার দোয়ার পুনরুক্তি করা।

[১০] সহিহ মুসলিম ৯৭০
[১১] আবু দাউদ ৫২১; তিরমিজি ২১২
[১২] সহিহ বুখারি ৬৩৩৯

৫- আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে দোয়া শুরু করা। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালার নাম, গুণাবলী এবং নিয়ামতসমূহের স্তুতি গাওয়া। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পড়া। এরপর নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা। পরিশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পড়ত আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা বাক্য দ্বারা দোয়ার ইতি টানা।

৬- দোয়াকারীর খাবার হালাল হওয়া। কোনো গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া না করা।

৭- দ্রুত কবুল করার জন্য পীড়াপীড়ি করা সমীচীন নয়। 'আমি দোয়া করলাম, এখনো সাড়া দিচ্ছে না' এমন কথা না বলা। আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত তাড়াহুড়া করে এমন কথা না বলবে যে, আমি দোয়া করেছি কিন্তু সাড়া দেয় নি- ততক্ষণ পর্যন্ত তার দোয়া কবুল হবে'।[১৩]

ইবনে বাত্তাল বলেন—'উক্ত হাদিসের মর্ম হলো, দোয়া করে ক্লান্ত হয়ে দোয়া পরিত্যাগ করা। নিজের দোয়া নিয়ে খোটা দিলে যেমন দোয়া বরবাদ হয়ে যায়, তখন তার অবস্থাও তেমনি হবে । অথবা সে কবুল করার যোগ্য কোনো দোয়া করেছে ঠিকই। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োর কারণে তার উদার দয়াবান রবের কবুলের পথটা কেটে দেবে কাস্তের ন্যায়; কোনো দোয়া কবুল করতে যার অক্ষমতা নেই, কোনো দানেই যার ভাণ্ডার ফুরাবার নয়।

উক্ত হাদিসে দোয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ আদবের কথা বলা হয়েছে। আর তা হলো, দোয়া অব্যাহত রাখা এবং কবুল হওয়া থেকে নিরাশ না হওয়া। এতে করে বান্দার আনুগত্য, বশ্যতা এবং মুখাপেক্ষিতা প্রকট আকারে প্রকাশ পাবে।

---

[১৩] সহিহ বুখারি ৬৩৪০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন'। [১]

সমস্ত নেককাজের প্রতিদান দশগুন বৃদ্ধি পায়। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা তো অন্যতম মহিমান্বিত নেক কাজ। তাই একবার দরূদ পাঠ করলে দশটি রহমত পাওয়া যায়।

ইবনে আরাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন—

> 'যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তো নিম্নোক্ত আয়াতে বলেই দিয়েছেন যে, 'যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজ করবে, সে তার মতো দশটির ফল পাবে'।[২] তাহলে এই হাদিসের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য কোথায়?'

তাহলে তার উত্তরে আমি বলব, 'অনেক বড় একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কুরআনের দাবি হলো, যে একটি ভালো কাজ করবে, তাকে দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

[১] সহিহ মুসলিম ৩৮৪

[২] সুরা আনআম ১৬০

ওপর দরূদ পাঠ করাও যেহেতু একটি ভালো কাজ, তাহলে কুরআনের দাবি অনুযায়ী তার প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতে দশটি স্তর উন্নীত হবে। এটি তো সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আরও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলোঃ যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দার কথা স্মরণ করছেন, এর চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য আর কী হতে পারে! আল্লাহ্ তায়ালা যেমন নিজের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, বান্দা তাঁকে স্মরণ করলে তিনিও তাকে স্মরণ করবেন। তদ্রুপ তাঁর রাসুলের স্মরনের প্রতিদানও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তিনিও ওই বান্দার কথা স্মরণ করবেন এবং তাঁর ওপর রহমত নাযিল করবেন'।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর একবার দরূদ পাঠ করলে তার প্রতিদান স্বরূপ দশটি রহমত নাযিল হয়- বিষয়টি এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার জন্য আরও অনেক ফজিলত রয়েছে। নিম্নে এমন কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো—

আনাস বিন মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'যার কাছে আমার আলোচনা করা হবে, সে যেন আমার ওপর দরূদ পাঠ করে। যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাকে দশ স্তর উন্নত করবেন'।[৩]

'যার কাছে আমার আলোচনা করা হবে, সে যেন আমার ওপর দরূদ পাঠ করে'—এখান থেকে একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনলে দরূদ পাঠ করা একটি আদেশ। অন্য একটি হাদিসেও এমন কথা আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'কৃপণ ওই ব্যক্তি, যার কাছে আমার আলোচনা করা হলো, আর সে

[৩] জামে সগির, সুয়ুতি ৮৬৬১; সহিহ নাসাঈ ১২৯৬

আমার ওপর দরূদ পাঠ করলো না'।[৪]

ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> 'পৃথিবীতে বিচরণকারী আল্লাহ্ তায়ালার কিছু ফেরেশতা আছেন, তাঁরা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেন'।[৫]

ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করবে ওই ব্যক্তি, যে আমার ওপর অধিক দরূদ পাঠ করে'।[৬]

জুমার দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর প্রচুর পরিমাণ দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। আউস বিন আউস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'তোমাদের সবচেয়ে উত্তম দিন হলো জুমার দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এই দিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং এই দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। অতএব, এই দিনে তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো; কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হবে'।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের দরূদ আপনার কাছে কীভাবে পেশ করা হবে, আপনি তো ইন্তিকাল করবেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—'আল্লাহ্ তায়ালা জমিনের জন্য নবীদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন'।[৭]

---

[৪] জামে তিরমিজি ৩৫৪৬

[৫] সুনান, নাসাঈ ১২৮২; মিশকাতুল মাসাবিহ ৯২৪

[৬] জামে তিরমিজি ৪৮৪

[৭] সুনান, নাসাঈ ১৩৭৪; আবু দাউদ ১০৪৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করার শব্দচয়ন কীভাবে হবে, তাও হাদিসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। নিম্নে দুটি হাদিস উল্লেখ করছি—

আবু মাসউদ আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন সাদ বিন উবাদা'র মাজলিসে বসে ছিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে আগমন করলেন। বাশির বিন সাদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে আপনার ওপর দরূদ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা কীভাবে আপনার ওপর দরূদ পড়বো?

আবু মাসউদ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা আফসোস করতে লাগলাম যে, সে যদি এই প্রশ্ন না করতো! এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> 'তোমরা এভাবে বলবেঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম, ওয়া আলা আ-লি ইবরাহিম। ওয়া বা-রিক আলা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহিমা ফিল আলামিন, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।'[৮]

আর সালাম কীভাবে দিতে হয় তা তো তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছ'।

কাব বিন উজরা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে আপনার ওপর সালাম পেশ করবো। কিন্তু আপনার ও আপনার পরিবারের ওপর দরূদ কীভাবে পাঠ করবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা বলবে—

> আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আলী মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহিম, ওয়ালা আ-লি ইবরাহিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আ-লি মুহাম্মাদ,

[৮] সুনান, নাসাঈ ১৩৭৪; আবু দাউদ ১০৪৭

কামা বারাকতা আলা ইবরাহিম, ওয়ালা আ-লি ইবরাহিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ'। [৯]

এছাড়াও বিভিন্ন হাদিসে দরুদের অনেক ধরণ রয়েছে। আগ্রহী পাঠক হাদিস ভাণ্ডারে খুঁজলেই অনায়াসে পেয়ে যাবেন।

[৯] সুনান, নাসাঈ ১৩৭৪; আবু দাউদ ১০৪৭

কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের নামায

আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় নবীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন—

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَه وَ ثُلُثَه

> 'আপনার রব জানেন যে, আপনি কখনো রাতের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ, কখনো অর্ধেক এবং কখনো তিন ভাগের এক ভাগ জেগে থাকেন' (ইবাদত করেন)।[১]

অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা নিজ বান্দাদের কিছু গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا

> 'আর যারা তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদারত এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত কাটায়।[২]

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'ফরজ নামাযগুলোর পর সবচেয়ে উত্তম নামায হলো কিয়ামুল লাইল।

---

[১] সুরা মুজ্জাম্মিল ২০

[২] সুরা আল ফুরকানব ৬৪

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামায থেকে ফারেগ হয়ে ফজর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো রাকাত নামায আদায় করতেন। প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন এবং সর্বশেষে এক রাকাত দিয়ে বেজোড় করে নিতেন'। [৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক লোকের কথা আলোচনা করা হলো, যে সকাল হওয়া পর্যন্ত ঘুমাত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললে—

> 'এই লোকের কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে'।[৪]

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে গেলে শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রতি গিঁটে সে এই বলে চাপড়ায় যে, তোমার সামনে দীর্ঘ রাত রয়েছে, সুতরাং তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর যদি সে জাগ্রত হয় এবং আল্লাহেক স্মরণ করে, তাহলে একটি গিঁঠ খুলে যায়। যদি অজু করে, আরও একটি গিঁঠ খুলে যায়। যদি নামায আদায় করে, তাহলে শেষ গিঁঠটিও খুলে যায়। ফলে সে উৎফুল্ল এবং নির্মল অন্তর নিয়ে সকালে পদার্পণ করে। অন্যথায় অলস এবং কপট হৃদয় নিয়ে সকালে পদার্পণ করে। [৫]

সকলে যখন ঘুমের কোলে নিশ্চিন্ত ঢলে পড়তো, ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু তখন নামাযে দাঁড়াতেন। ভোর পর্যন্ত তাঁর থেকে মৌমাছির মতো গুঞ্জন শোনা যেত।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ তাহাজ্জুদ গুজরাণ সবার

---

[৩] সহিহ মুসলিম ১৬০৩

[৪] সহিহ বুখারি ১১৪৪

[৫] সহিহ বুখারি ১১৪২

চেয়ে উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী হয় কেন? তিনি বললেন, ‘কারণ তাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার সাথে নিভৃতে অবস্থান করে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে নিজ নূর থেকে একটি নূর দিয়ে আলোকিত করে দিয়েছেন’।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন—‘মানুষ গুনাহ করতে করতে এক পর্যায়ে কিয়ামুল লাইল থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়’।

এক লোক একজন আল্লাহ্ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো—আমি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে পারি না। আমাকে কোনো প্রতিষেধক দিন। তিনি বললেন, ‘দিনের বেলা তাঁর অবাধ্যতা করো না, তাহলে তিনি রাতের বেলা তোমাকে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান করবেন’।

সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ‘আমি একটি গুনাহের কারণে পাঁচ মাস তাহাজ্জুদ নামায থেকে বঞ্চিত ছিলাম’।

আবু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘ফুর্তিবাজ মানুষ নিজেদের প্রমোদে যে পরিমাণ মস্তিতে থাকে, রাতের ইবাদতকারীগণ নিশিতে তাদের চেয়ে অধিক মস্তিতে থাকে; যদি রাত না থাকতো, তাহলে আমি দুনিয়ায় অবশিষ্ট থাকাকে পছন্দ করতাম না’।

ইবনে মুনকাদির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—‘দুনিয়ার মধ্যে তিনটি মাত্র আনন্দ অসমাপ্ত রয়েছেঃ কিয়ামুল লাইল, বন্ধুদের সাক্ষাৎ এবং জামাআতের নামায’।

দুনিয়াবিমুখতা ও তার তুচ্ছতার বর্ণনা

সাহল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা করলে আল্লাহও আমাকে ভালবাসবেন, মানুষের কাছেও আমি পছন্দের পাত্র হতে পারবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> 'দুনিয়া থেকে বিমুখ হও, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন। মানুষের কাছে যা আছে, তা থেকে নিবৃত্ত হও, মানুষ তোমাকে ভালবাসবে'।[১]

আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত মানুষদের পছন্দ করেন, উক্ত হাদিস থেকে এই কথাই প্রতীয়মান হয়।

সুফিয়ানে কেরাম বলেন—'আল্লাহর ভালোবাসা যেমন সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্তর, তেমনি দুনিয়াবিমুখতা সবচেয়ে উত্তম অবস্থা হিসেবে পরিগণিত'।

দুনিয়াবিমুখতার আরবি শব্দ হলো 'যুহদ'। অর্থ হলো—কোনো জিনিষ থেকে আকর্ষণ সরিয়ে তার চেয়ে উত্তম কোনো জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। তখন এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, ত্যাগকৃত জিনিষ ত্যাগকারীর দৃষ্টিতে গৃহীত জিনিষের তুলনায় তুচ্ছ এবং নগণ্য হিসেবে দেখা দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এই কথা অনুধাবন করতে পারবে যে, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে যা আছে, তা চিরস্থায়ী; আখিরাত স্থিতিশীল এবং উত্তম, সে বিশ্বাস

[১] ইবনে মাজাহ ৪১০২; রিয়াদুস সালিহিন ৪৭৫

করবে যে, দুনিয়া হলো সূর্য কিরণে রাখা বরফের ন্যায়, অস্থায়ী এবং ক্রমনিঃসৃত। আর আখিরাত হলো মণি-জহরতের ন্যায়, স্থিতিশীল এবং স্থায়ী। এমন লোককেই বলা হয় 'যাহিদ' তথা দুনিয়াবিমুখ।

উপরোক্ত বিশ্বাস যার অন্তরে যত দৃঢ় হবে, দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্য রেখা যার মনে যত বদ্ধমূল হবে, তার দুনিয়া বিক্রি করে, বর্জন করে আখিরাতে নিবিষ্ট হওয়া এবং তা অর্জন করার প্রতি ব্যগ্রতা হবে তেমনি প্রচণ্ড অনড়। কুরআনে কারিম দুনিয়া বিমুখতা এবং আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অনেক প্রশংসা করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى

'বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ আখিরাত হলো উত্তম এবং স্থায়ী'।[২]

অন্যত্র বলেন—

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ

'তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করো; আর আল্লাহ্ তায়ালা (তোমাদের জন্য) চান আখিরাত'। [৩]

আরও বলেন—

وَ فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ

'তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে আনন্দিত; অথচ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় ক্ষণিকের ভোগ মাত্র'।[৪]

দুনিয়ার নিন্দা করে এবং আল্লাহ্ তায়ালার কাছে এর তুচ্ছতা বর্ণনা করে এমন হাদিসের সংখ্যা প্রচুর। নিম্নে কিছু তুলে ধরা হলো—

[২] সূরা আ'লা ১৬-১৭
[৩] সূরা আনফাল ৬৭
[৪] সূরা রাদ ২৬

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তার দুপাশে আরও অনেক লোক ছিল। এমন সময় তিনি ছোট কান বিশিষ্ট মৃত একটি ছাগল ছানার পাস দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি তা নিজ হাতে উঠিয়ে নিলেন এবং তার কান ধরে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এটাকে এক দিরহামে নিতে ইচ্ছুক? লোকেরা বলল, কোনো জিনিষের বিনিময়ে আমরা এটা নিতে ইচ্ছুক না। তাছাড়া আমরা এটা দিয়ে করব কি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি পছন্দ করো যে, এটা তোমাদের হোক? তারা বলল, আল্লাহর শপথ, সে যদি জীবিতও থাকতো, তবুও তার মাঝে ত্রুটি দেখা হতো যে, তার কান ছোট। এখন তো সে মৃত! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> আল্লাহর শপথ, এই ছাগল ছানা তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তার চেয়েও তুচ্ছ হলো দুনিয়া। [৫]

মুসতাওরিদ বিন শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এতোটুকু, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের পানিতে তার একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে তুলে আনল। সে দেখুক তার আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরে এসেছে'। [৬]

সাহল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> 'দুনিয়া যদি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে মাছির একটি ডানা পরিমাণ সমমূল্যের হতো, তাহলে একজন কাফেরকেও সেখান থেকে এক ঢোঁক পানি পান করাতেন না'। [৭]

---

[৫] সহিহ মুসলিম ২৯৫৭

[৬] জামে তিরমিজি ২৩২৩; ইবনে মাজাহ ৪১০৮

[৭] জামে তিরমিজি ২৩২০

যুহদ—কোনো জিনিষের তুচ্ছতা, অপছন্দনিয়তা এবং তার প্রতি ঘৃণার কারণে তাকে বর্জন করার নাম।

ইউনুস বিন মাইসারা রহিমাহুল্লাহ বলেন—'হালাল জিনিসকে হারাম বানিয়ে নেওয়া কিংবা সম্পদ নষ্ট করার নাম দুনিয়াবিমুখতা নয়; বরং দুনিয়াবিমুখতা হলো, তোমার হাতে বিদ্যমান সম্পদের চেয়ে আল্লাহর হাতে থাকা সম্পদের প্রতি অধিক আস্থাশীল হওয়া, কোনো মসিবতে আক্রান্ত হওয়ার কালে এবং সাধারণ অবস্থায় তোমার অবস্থান অভিন্ন থাকা এবং সত্যের ক্ষেত্রে তোমার কাছে প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী একই স্তরের হওয়া'।

ইউনুস বিন মাইসারা রহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত বাণীতে তিনটি জিনিসকে যুহদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত তিনটি জিনিসই বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে নয়; বরং অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যই আবু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'কারও বাহ্যিক অবস্থা দেখে তার ব্যাপারে দুনিয়াবিমুখতার সাক্ষ্য দিও না'।

প্রথমঃ বান্দা নিজের হাতে বিদ্যমান সম্পদের চেয়ে আল্লাহর হাতে থাকা সম্পদের প্রতি অধিক আস্থাশীল হওয়া—এটা সৃষ্টি হয় ইয়াকিন ও বিশ্বাস শক্তিশালী ও সঠিক হলে । দরবেশ আবু হাযিম রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার কী কী সম্পদ আছে? তিনি বললেন, 'আমার কাছে দুটি সম্পদ আছে; এগুলো থেকে আমি দারিদ্রতার আশংকা করি নাঃ ১- আল্লাহর প্রতি ভরসা। ২- মানুষের সম্পদ থেকে নিরাশা'।

তাঁকে বলা হলো—'আপনি কি অনটনের ভয় করেন না? তিনি বললেন, আসমানসমূহে যা কিছু আছে, জমিনে যা কিছু আছে, উভয়ের মাঝখানে এবং মাটির নিচে যা কিছু আছে, সবকিছুর মালিক আমার মাওলা; আমি কি দারিদ্রতার ভয় করতে পারি!'

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন—'আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো যুহদ। অল্পেতুষ্ট ব্যক্তিও দুনিয়াবিমুখ। সেই মূল ধনী, যার বিশ্বাস হবে পাকাপোক্ত, সে তার সমস্ত কাজ আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করবে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করবে, সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে

ফেলবে আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ভয় ও আশা নিয়ে এবং অন্যায় উপায়ে দুনিয়া তালাশ করা থেকে বিরত থাকবে। যে এমন হতে পারবে, সেই প্রকৃত দুনিয়াবিমুখ এবং সেই হবে সবচেয়ে ধনী মানুষ; যদিও তার বাহ্যিক কোনো সম্বল না থাকে।

আম্মার বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'উপদেশ গ্রহণের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট। ধনাঢ্যতার জন্য বিশ্বাসই যথেষ্ট এবং ইবাদতের জন্য ব্যস্ততাই যথেষ্ট'।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ইয়াকিন বা বিশ্বাস হলো, তুমি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষকে সন্তুষ্ট করবে না। আল্লাহ্ তায়ালার রিজিক দেখে কাউকে হিংসা করবে না। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে যা দেন নি তা নিয়ে কাউকে তিরস্কার করবে না; কেননা কোনো লোভীর লোভ আল্লাহ্ তায়ালার রিজিককে টেনে আনতে পারে না, তদ্রূপ কোনো অপছন্দকারির অনিচ্ছা তাকে বাধাপ্রাপ্ত করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নির্ণয়, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা দিয়ে খুশি ও আনন্দকে রেখে দিয়েছেন বিশ্বাস ও তুষ্টির মধ্যে। আর দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা রেখে দিয়েছেন সংশয় ও অসন্তোষে'।

দ্বিতীয়ঃ বান্দা যখন দুনিয়াবি কোনো মুসিবতে পতিত হবে, যেমন সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়া, সন্তান মারা যাওয়া ইত্যাদি, তখন সে এসব হারানোর সওয়াবের জন্য ব্যাকুল হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যা তার হাতছাড়া হয়ে গেছে, আখিরাতে তার জন্য তা অপেক্ষা করছে, এই কথা মেনে নেবে—এই গুণও ব্যক্তির ইয়াকিন বা বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা থেকে সৃষ্টি হয়।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, যাবতীয় মসিবত তার কাছে তুচ্ছ এবং সহজ হয়ে যাবে।

জনৈক সালাফ বলেছেন—'যদি দুনিয়াবি মসিবত না থাকতো, তাহলে আমরা আখিরাতে পদার্পণ করতাম রিক্তহস্তে'।

তৃতীয়ঃ বান্দার কাছে তার সত্যের ব্যাপারে প্রশংসাকারী এবং নিন্দাকারী উভয়ে সমান হবে। পক্ষান্তরে যদি দুনিয়া বান্দার অন্তরে মূল্যবান ও বড় হয়, তখন সে প্রশংসাকে পছন্দ করবে এবং নিন্দাকে ঘৃণা করবে।

ক্ষেত্রবিশেষ নিন্দার ভয়ে সে অনেক হক কাজ ছেড়ে দেবে এবং প্রশংসার আশায় অনেক মন্দ কাজও আঞ্জাম দিয়ে ফেলবে।

কারও কাছে যদি সত্যের ক্ষেত্রে প্রশংসাকারী এবং নিন্দুক বরাবর হয়, তাহলে এটি তার অন্তর থেকে সৃষ্টির মূল্য পতিত হয়ে হকের মহব্বতে তা পূর্ণ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তার অন্তর নিজ মাওলার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট, এটা প্রস্ফুটিত হবে। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ইয়াকিন বা বিশ্বাসের দাবি হলো, তুমি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষকে সন্তুষ্ট করবে না'।

যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন। সালাফদের থেকে যুহদের ব্যাখ্যা সম্বলিত বিভিন্ন বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন—'দুনিয়াবিমুখ বা পরহেজগার হলো ওই ব্যক্তি, যে অন্যকে দেখলে বলে, সে তো আমার চেয়ে বেশি পরহেজগার'।

যে ব্যক্তির কাছে সম্পদ আছে সে কি যাহিদ তথা দুনিয়াবিমুখ হতে পারে? এই প্রশ্ন করা হয় একজন আল্লাহ্ওয়ালাকে। সম্ভবত তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ। তিনি উত্তরে বলেন, 'যদি সম্পদ বৃদ্ধি হলে সে আনন্দিত না হয় এবং তা হ্রাস পেলে চিন্তিত না হয়, তাহলে সে যাহিদ। সে প্রকৃত দুনিয়াবিমুখ'।

ইবরাহিম বিন আদহাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, যুহদ তিন প্রকারঃ ফরজ যুহদ, সীমাতিরিক্ত যুহদ, নিরাপদ যুহদ।

ফরজ যুহদ হলো—যাবতীয় হারাম থেকে বিমুখ হওয়া। সীমাতিরিক্ত যুহদ হলো—হালাল থেকেও বিমুখ হওয়া। আর নিরাপত্তার যুহদ হলোঃ সমস্ত সংশয় থেকে বিরত থাকা।

যারা আখিরাত বিক্রি করে দুনিয়া আঁকড়ে ধরে, তাঁরা আখিরাতবিমুখি যাহিদ। আর যারা দুনিয়া বিক্রি করে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়, তারা দুনিয়াবিমুখ যাহিদ।

এক লোক একজন নেককার মানুষকে বলল, আমি আপনার চেয়ে বড় যাহিদ আর কাউকে দেখিনি। তিন বললেন, 'তুমিই তো আমার চেয়ে বড় যাহিদ। আমি তো অস্থায়ী অবিশ্বস্ত দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়েছি। আর তুমি তো আখিরাত থেকে বিমুখ হয়েছ। তাহলে তোমার চেয়ে বড় যাহিদ আর কে হতে পারে!'

যুহদ শব্দটি যদিও দুনিয়াবিমুখতা এবং আখিরাতবিমুখতা উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহারিত হয়। কিন্তু দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রেই তা অধিক প্রচলিত এবং পরিচিত হয়ে গেছে।

যুহদ হয় মানুষের ক্ষমতার ভেতরের কোনো জিনিষের ক্ষেত্রে। ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রকৃত যাহিদ তো ছিলেন উমর বিন আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ। যখন দুনিয়া ধরাশায়ী হয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে, তিনি তাকে পরিহার করেছেন। আর আমি, কোন জিনিষ থেকে যুহদ করব! (অর্থাৎ আমার কাছে তো কিছুই নেই)।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন—'আমি এমন কিছু মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, এমন কিছু কাফেলার সঙ্গ উপভোগ করেছি, যারা দুনিয়ার কোনো জিনিষের আগমনে আনন্দিত হতেন না এবং দুনিয়ার কোনো জিনিষ হাতছাড়া হয়ে গেলে তার জন্য আফসোসও করতেন না। দুনিয়া তাদের চোখে মাটি থেকেও তুচ্ছ ছিল। তাদের কেউ কেউ বছরকে বছর কাটিয়ে দিতেন এমন অবস্থায় যে, তাদের কোনো কাপড় ভাজ করা হতো না (এক কাপড়েই কাটিয়ে দিতেন)। তাদের জন্য ডেক বসানো হতো না (না খেয়েই থাকতেন)। তাদের মাঝে এবং জমিনের মাঝে কোনো কিছু বিছানো হতো না (মাটিতেই শুয়ে থাকতেন)। বাড়ীতে কখনো খানা পাকানোরও আদেশ দিতেন না। কিন্তু যখন রাত হতো, তাঁরা দাঁড়িয়ে যেতেন তাদের পায়ে ভর করে, লুটিয়ে পড়তেন সিজদায়, তাদের কপোল বেয়ে ঝরে পড়তো তপ্ত অশ্রুবান; নিজেদের মুক্তির জন্য তাঁরা স্বীয় রবের কাছে আকুতি মিনতি জানাতে থাকতেন। তাঁরা কোনো ভালো কাজ করলে তার শুকরিয়া আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং আল্লাহর কাছে আবেদন করতেন যেন তা কবুল করা হয়। তদ্রুপ কোনো গুনাহের কাজ করে ফেললে অস্থির হয়ে যেতেন

এবং তা ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতেন। আমৃত্যু তাদের অবস্থা এমনই ছিল। আল্লাহর শপথ, তারা গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে নি, গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে নি, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার ছাড়া। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ওপর দয়া করুন এবং তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান'।

যুহদের স্তরসমূহ

প্রথম স্তর—বান্দা দুনিয়ার জন্য আগ্রহী, তার অন্তর পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট, তার নফস ভোগ বিলাসের জন্য উন্মত্ত; কিন্তু সে তার নফস এবং অন্তরের বিরোধিতা করে এবং নিজেকে বিরত রাখে। এই প্রকারের লোকদের বলে সন্ন্যাসী কিংবা তাপস।

দ্বিতীয় স্তর—দুনিয়ার প্রতি কামনা আছে কিন্তু বান্দা স্বেচ্ছায় তাকে তুচ্ছ ভেবে তা তেকে বিরত থাকে। তবে সে তার দুনিয়াবিমুখতার দিকে আড়চোখে তাকায় এবং সে দিকে মনোযোগ দেয়। যেমন কেউ এক দিরহাম ত্যাগ করে দুই দিরহাম পাওয়ার আশায়।

তৃতীয় স্তর—স্বেচ্ছায় দুনিয়া বিমুখ হয় এবং সর্বান্তকরণে তা পরিহার করে। সে কোনো কিছু ত্যাগ করেছে এটা কল্পনাও করে না। সে হলো ওই ব্যক্তির ন্যায় যে মৃৎপাত্র ছেড়ে দিয়েছে এবং মণিমুক্তা গ্রহণ করেছে।

এই স্তরের উদাহরণ দেওয়া যায় ওই ব্যক্তির ন্যায়, যাকে বাদশার দরবারে যেতে বাধা দিয়েছে ফটকে দাঁড়িয়ে থাকা এক কুকুর। তখন সে ব্যক্তি কুকুরের দিকে এক টুকরো রুটি নিক্ষপে করলো। কুকুর যখন রুটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন সে সুযোগ বুঝে বাদশার দরবারে প্রবেশ করলো এবং বাদশার নৈকট্য অর্জন করে নিলো। শয়তান আল্লাহর দরবারের ফটকে এক কুকুর। ফটক উন্মুক্ত, সেখানে নেই কোনো পর্দা কিংবা আবরণ। তথাপি সে মানুষকে প্রবেশ করতে বাঁধা দেয়। আর দুনিয়া হলো এক টুকরো রুটির ন্যায়; যে বাদশার সম্মান লাভের জন্য তা পরিহার করে, সে কীভাবে তার দিকে মনোযোগ রাখতে পারে!

নফসের প্রকারভেদ

আল্লাহ্ওয়ালা আধ্যাত্মিক বুজুর্গগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কলব এবং আল্লাহর মাঝে মেলবন্ধন সৃষ্টি করার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলো নফস। নফসকে ধরাশায়ী করা, তার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং তার বিরোধিতা করে তাকে পরিত্যজ্য করার পরই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব।

এক্ষেত্রে মানুষ দুই প্রকার। এক প্রকার মানুষ, তাদের নফস তাদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে নেয় এবং তাকে ধ্বংসের খাঁদে নিক্ষেপ করে। ফলে তারা নফসের হাতে অসহায় বন্দীতে পরিণত হয়। আরেক দল মানুষ, তারা নিজেদের নফসের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তাকে ভূপাতিত করে। ফলে নফস তার বাধ্য অনুগত দাসে পরিণত হয়।

জনৈক সালাফ বলেছেন, আত্মশুদ্ধির পথ অনুসারীদের সফর শেষ হয় নিজেদের নফসের ওপর বিজয় লাভ করার মাধ্যমে। যদি নফসের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে, তাহলে সে সফল এবং কামিয়াব। আর যদি নফস তার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে নেয়, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন—

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى

'যে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে তার প্রভুর সামনে

দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তার বাসস্থান হবে জান্নাত'। [১]

নফস, ব্যক্তিকে সীমালঙ্ঘন এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ডাকেন, তার ভয় এবং নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখার দিকে। কলব উভয় আহ্বানকারীর মাঝখানে অবস্থান করে। একবার সে নফসের দিকে ঝুঁকে যায়, আরেকবার রবের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই স্থানটিই হলো সবচেয়ে কঠিন এবং বিপর্যয়কর।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে নফসের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করেছেনঃ মুতমাইন্নাহ তথা প্রশান্ত। লাওয়ামা তথা নিন্দুক। আম্মারা বিস সু' তথা কুমন্ত্রণা দাতা।

নফসে মুতমাইন্নাহ

যখন নফস আল্লাহ্ তায়ালার দিকে আকৃষ্ট হয়, তাঁর জিকিরে প্রশান্তি লাভ করে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব হয় এবং তাঁর নৈকট্য কামনা করে, তখন তা মুতমাইন্নায় পরিণত হয়। এই নফসকে মৃত্যুর সময় বলা হবেঃ 'হে প্রশান্ত আত্মা, সন্তুষ্ট এবং সন্তোষভাজন হয়ে তোমার রবের দিকে ফিরে এসো'। [২]

ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মুতমাইন্নাহ মানে হলো সত্যায়িত'।

কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন—'মুতমাইন্নাহ হলো ওই মুমিন যার অন্তর আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাশীল। ওই ব্যক্তি তার রবের নাম ও গুণাবলী এবং তিনি নিজের ব্যাপারে ও তাঁর রাসুলের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি প্রশান্ত বিশ্বাসী। মৃত্যু-পরবর্তী কবর জগতের জীবন সম্পর্কে এবং তারও পর কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেগুলোর ওপর সে স্থির বিশ্বাস স্থাপন করে, কেমন যেন সে স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ্য করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারণের

[১] সূরা নাজিয়াত ৩৭-৪০

[২] সূরা ফাজর ২৭-২৮

ওপর অটল বিশ্বাস আরোপণ করে এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়। কখনও বিরাগভাজন হয় না, কোনো অভিযোগ করে না এবং তাঁর ঈমানেও কোনো চিড় ধরতে দেয় না। ফলে যা হাতছাড়া হয়ে যায় বা যা অপ্রাপ্য থেকে যায় তার জন্য নিরাশ হয় না এবং যা কিছু সে পেয়েছে তা নিয়ে অধিক উল্লসিত আনন্দিতও হয় না। কেননা সমস্ত মসিবত তার কাছে আসার আগে, তার সৃষ্টিরও পূর্বে, নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَه

> 'তারা যেই মুসীবতের সম্মুখীন হোক না কেন, তা আল্লাহরই আদেশে। আর যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তিনি তার অন্তরকে সঠিক পথের দিশা দান করবেন'। [৩]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক সালাফ বলেন—'এখানে ওই বান্দার কথা বলা হয়েছে, যার ওপর কোনো মসিবত আপতিত হয় এবং সে বিশ্বাস করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। তাই সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং নিজের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করে'।

সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইতমিনান তথা প্রশান্তি হলো, বাধ্য অনুগত একনিষ্ঠ এবং সতর্কতার সহিত আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করা। তাঁর আদেশের সামনে কোনো ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সংস্কৃতি কিংবা প্রথাকে প্রাধান্য না দেওয়া। তাঁর সংবাদবিরোধী কোনো সংশয় অন্তরে না রাখা। তাঁর আদেশবিরোধী কোনো কামনায় না জড়ানো। বরং কখনো যদি এসব বান্দার অন্তরে উদয় হয়, তাহলে সে এগুলোকে কুমন্ত্রণা আখ্যায়িত করবে, এগুলো গ্রহণ করার চেয়ে আকাশ থেকে জমিনে ভূপাতিত হওয়া তার কাছে অধিক প্রিয় হবে। অনুরূপ গুনাহের অস্থিরতা এবং বিরক্তি থেকে তাওবার প্রশান্তি এবং সুস্থিরতার দিকে ধেয়ে আসবে। কেউ এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারলে তার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথা প্রয়োগ হবে, 'এটাই স্পষ্ট ঈমান'।

যখন কোনো বান্দা সংশয় থেকে বিশ্বাসে, মূর্খতা থেকে জ্ঞানে, উদাসীনতা

[৩] সূরা তাগাবুন ১১

থেকে আল্লাহর স্মরনে, বিশ্বাসঘাতকতা থেকে তাওবার দিকে, দেখানোপনা থেকে ইখলাস ও একনিষ্ঠতার দিকে, মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে, অক্ষমতা থেকে বিচক্ষণতার দিকে, আত্মঅহমিকার দাপট থেকে বাধ্যতার বশ্যতায় এবং ঔদ্ধত্য থেকে বিনয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আশ্রয় নেবে এবং বাসস্থান গড়ে তুলবে, তখন তার নফস নফসে মুতমাইন্নাহ বলে পরিগণিত হবে।

আর এসব কিছুর মূল হলো, মনোযোগ এবং সতর্কতা। এদুইয়ের মাধ্যমে তার অন্তর থেকে উদাসীনতার তন্দ্রা দূর হয়ে যাবে এবং তার জন্য জান্নাতের অট্টালিকা উজ্জ্বল করে দেবে। তখন সে চিৎকার করে বলবেঃ হে আমার নফস, রাতের এই অমানিশায় তোমার প্রচেষ্টায় আমাকে একটু সহযোগিতা করো; তাহলে কিয়ামতের দিন ওই সমস্ত সুউচ্চ প্রাসাদে আরামের জীবন লাভ করতে পারবে।

সতর্কতার আলোয় সে দেখতে পাবে তার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে সব। অনুধাবন করতে পারবে মৃত্যু থেকে চিরস্থির জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত তার সাথে কী ব্যবহার করা হবে। দুনিয়ার ত্বরিত ক্ষয়, অধিবাসীদের প্রতি তার অবিশ্বস্ততা এবং প্রেমিকদের জন্য তার ঘাতকমূর্তি অনুভব করতে পারবে। উক্ত আলোয় সে উপলব্ধি করবে ওই ব্যক্তির কথা যে বলবেঃ 'হায় আফসোস, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছি!' [৪]

তখন সে বাকি জীবন বিগত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে ব্যয় করবে, যে জীবন সে নিষ্প্রাণ কাটিয়ে দিয়েছে সেখানে ফিরিয়ে আনবে প্রাণের সতেজতা, যত ভুল সে করেছে তার জন্য হবে অনুতপ্ত, যে সময়টুকু অবশিষ্ট আছে তাকে যথার্থ কাজে লাগাবে; এই সময়টুকু যদি বেহাত হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত কল্যাণ থেকে সে বঞ্চিত হবে, এই অনুভূতি তার অন্তরে জাগরিত হবে।

সতর্কতা ও মননিবেশের প্রদীপ থেকে এবং তার ওপর তার রবের নিয়ামতের আলোক থেকে সে প্রত্যক্ষ্য করবে যে, সে তার রবের নিয়ামতসমূহ গণনা করে শেষ করার সক্ষমতা রাখে না; সেগুলোর পরিপূর্ণ হক আদায় করতে অক্ষম। উক্ত আলোয় সে নিজের নফসের দোষ-ত্রুটি, আমলের ঘাটতি,

[৪] সূরা যুমার ৫৬

কৃত গুনাহ ও অপরাধ, অনেক হক ও কর্তব্য আদায় করা থেকে অনীহা ইত্যাদি স্পষ্ট দেখতে পাবে। তখন তার অন্তর নত হবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হবে নম্র। ফলে সে নিজের দোষ ত্রুটি গুনাহ অপরাধ হিসেব করত তার রবের নিয়ামতের বারিধারা দেখে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে অবনত মস্তকে।

উক্ত প্রদীপশিখায় সে দেখতে পাবে, তার সময় খুবই মূল্যবান এবং ভয়ানক। এটাই তার সৌভাগ্যের একমাত্র মূলধন। তখন থেকেই সে আল্লাহর অবাধ্যতায় তা ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করবে; কেননা তার এই সুমতি অর্জন হয়ে গিয়েছে যে, যদি সময় বিনষ্ট হয়, তাহলে সে ক্ষতি এবং পরিতাপের সম্মুখীন হবে। আর যদি সে তা কাজে লাগায়, তাহলে সে পাবে শান্তি ও সৌভাগ্যের পায়রার দেখা।

এসবই হলো সতর্কতা, মনোযোগ এবং অভিনিবেশের ফল ও প্রভাব। এটাই হলো নফসে মুতমাইন্নাহ'র প্রথম স্তর; এখান থেকেই আল্লাহ্ এবং পরকালের পথের যাত্রা শুরু হয়।

নফসে লাওয়ামা

একদল উলামায়ে কেরাম বলেন, 'নফসে লাওয়ামা হলো ওই নফস যা কখনো এক অবস্থার ওপর স্থির থাকে না। তার রয়েছে বিচিত্র রং ও ঢং। কখনো সে মনযোগী হয়, আবার কখনো হয়ে যায় উদাসীন। উপেক্ষা করে আবার আত্মনিয়োগ করে। ভালোবাসে আবার ঘৃণা করে। খুশি হয় আবার দুঃখিত হয়। সন্তুষ্ট হয় আবার ক্রোধান্বিত হয় এবং অনুসরণ করে আবার বিরত থাকে ইত্যাদি এসব তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য'।

আরেকদল উলামায়ে কেরাম বলেন, 'এটা মুমিনের অন্তর'। হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তুমি মুমিন ব্যক্তিকে দেখবে সর্বদা নিজের নফসকে তিরস্কার করছে। সে বলে, আমি এমনটা চাই নি, আমি কেন এমনটা করলাম, এটা তো ওটার চেয়ে ভালো ছিল ইত্যাদি'।

আরও একদল বলেন, 'লাওম হলো কিয়ামত দিবস। কেননা ওই দিন যারা অন্যায় করেছে কিংবা কর্তব্য পালনে ত্রুটি করেছে তারা সকলেই নিজেকে তিরস্কার করবে'।

উলামায়ে কেরামের উপরোক্ত বিভিন্ন বক্তব্য উল্লেখ করত আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'উক্ত সমস্ত মতই সঠিক। নফসে লাওয়ামা দুই প্রকারঃ নিন্দিত লাওয়ামা এবং অনিন্দিত লাওয়ামা'।

নিন্দিত লাওয়ামা

'নিন্দিত নফসে লাওয়ামা হলো ওই নফস, যা মূর্খ এবং জালেম। আল্লাহ্ এবং ফেরেশতাগণ এই নফসের নিন্দা করেছেন'।

অনিন্দিত লাওয়ামা

'এটা হলো ওই নফস, যা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ইবাদতে ত্রুটি করার কারণে অবিচ্ছিন্নভাবে তার ধারককে তিরস্কার করতে থাকে। এই নফস নিন্দিত না। বরং যার নফস তাকে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত না করার জন্য তিরস্কার করে, তাঁর সন্তুষ্টির পথে অন্যের নিন্দা সহ্য করে এবং আল্লাহ্ তায়ালার জন্য কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করে, তার নফসই তো হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নফস এবং এই নফস আল্লাহ্ তায়ালার তিরস্কার ও নিন্দা থেকে নিরাপদ। পক্ষান্তরে যে নফস তার ধারকের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাকে তিরস্কার না করে এবং আল্লাহর জন্য কোনো নিন্দা সহ্য না করে, এই নফস আল্লাহ্ তায়ালার নিন্দা ও তিরস্কারের পাত্র।

নফসে আম্মারা বিস সু'

এই নফস সমস্ত অন্যায় ও অশুভ কাজের মন্ত্রণা দেয়। এটাই তার তবিয়ত। আল্লাহ্ তায়ালার তাওফিক ব্যতীত কেউ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। এই নফসই হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের নিন্দিত এবং কলঙ্কিত। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনায় আজিজের স্ত্রীর আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

> 'আমি আমার নফসকে দোষমুক্ত বলি না। নফস তো কুমন্ত্রণা দিয়েই থাকে। তবে আমার প্রভু অনুগ্রহ করলে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল, দয়ালু। [৫]

অন্যত্র বলেন—

> 'তোমাদের ওপর যদি আল্লাহ্ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র থাকতে পারতো না'। [৬]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রয়োজন পূরণের খোতবা শিক্ষা দিতে গিয়ে এভাবে বলেছেন—

> 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছেই আমাদের নফসের অনিষ্ট এবং মন্দ কাজের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই'। [৭]

মন্দ ও অনিষ্ট নফসের অভ্যন্তরে প্রোথিত। তার কারনেই মন্দ ও খারাপ কাজ সম্পাদিত হয়। আল্লাহ্ তায়ালা যদি বান্দাকে তার নফসের হাতে ছেড়ে দেন, সে তার অনিষ্ট এবং মন্দ কাজের কারণে হালাক হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সক্ষমতা দান করেন এবং সহযোগিতা করেন, তাহলে সে সব ধরণের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

আমরা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমাদের নফস এবং মন্দ ও গুনাহের কাজের অনিষ্ট থেকে পানাহ ভিক্ষা চাই।

তো চূড়ান্ত কথা হলোঃ মানুষের শরীরে নফস একটাই। কখনো তা আম্মারা হয়, লাওয়ামা হয় কখনো, আবার কখনো মুতমাইন্না হয়।

নফসে মুতমাইন্নাহ'র সহচর থাকেন একজন ফেরেশতা। তিনি তাকে সঠিক দিশা দেখান। তার মাঝে হকের আলো নিক্ষেপ করেন। তাকে

---

[৫] সুরা ইউসুফ ৫৩

[৬] সুরা নূর ২১

[৭] সুনান ইবনে মাজাহ ১৮৯২

সত্যের দিকে উৎসাহিত করেন। তাকে সত্যের সুন্দর সমুজ্জ্বল চেহারা প্রদর্শন করান। বাতিল থেকে তাকে বিরত রাখেন। অন্যায় থেকে নিবৃত্ত রাখেন এবং গুনাহের কুৎসিত রূপ প্রত্যক্ষ্য করান। মোটকথা, আল্লাহ্ তায়ালার জন্য এবং আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় জিনিষ নফসে মুতমাইন্নাহ থেকে উৎপাদিত হয়।

পক্ষান্তরে নফসে আম্মারার দোসর হয় শয়তান। সে তার সঙ্গ দেয়। তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়। আশা ভরসা দেয়। তার মাঝে বাতিল ও মিথ্যা ঢেলে দেয়। তাকে অন্যায় ও মন্দ কাজের আদেশ ও মন্ত্রণা দেয়। মন্দকে তার সামনে সুশোভিত করে তুলে ধরে। তাকে দীর্ঘ আশা দেয়। তার সামনে বাতিলকে এতো সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত করে যে, সে তা গ্রহণ করে এবং সুন্দর মনে করতে থাকে।

নফসে মুতমাইন্না এবং তার সহচর ফেরেশতা ব্যক্তি থেকে নিম্নোক্ত সমস্ত জিনিষের দাবি জানায়ঃ আল্লাহ্ তায়ালার একত্ব, দাসত্ব, সততা, খোদাভীতি, আল্লাহ-নির্ভরতা, তাওবা, প্রত্যাবর্তন, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা, দুনিয়ার বুকে আশা স্বল্প রাখা, মৃত্যু এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি।

অন্যদিকে শয়তান এবং তার কাফের মুনাফিক সাঙ্গপাঙ্গরা নফসে আম্মারার কাছে এর বিপরীত জিনিষগুলো দাবি করে।

নফসে মুতমাইন্নার জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিজের আমলকে শয়তান থেকে মুক্ত করা এবং নফসে আম্মারা থেকে দূর রাখা। যদি উভয়কে ভেদ করে কোনো একটি আমল আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, তাহলে তা বান্দার মুক্তির জন্য যথেষ্ট। কিন্তু নফসে আম্মারা এবং শয়তান দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে, আল্লাহ্ পর্যন্ত একটি খালেস আমল পৌঁছতে দেবে না। এজন্যই জনৈক আল্লাহ্ওয়ালা বলতেন, 'আমি যদি জানতে পারতাম যে, আমার একটি ইবাদত আল্লাহ্ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তাহলে মুসাফির তার পরিবারে ফিরে আসলে যে পরিমাণ আনন্দ লাভ হয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হতাম মৃত্যুর জন্য।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি যদি জানতাম যে,

আল্লাহ্ তায়ালা আমার একটি সাজদা কবুল করেছেন, তাহলে মৃত্যু আমার কাছে অধিক প্রিয় হতো, প্রবাসীর নীড়ে ফিরে আসা থেকে'।

কখনো নফসে আম্মারা সরাসরি নফসে মুতমাইন্নার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে নফসে মুতমাইন্না কোনো কল্যাণকর বিষয় উত্থাপন করলেই আম্মারা এসে তার প্রতিপক্ষ হয় এবং তার ভালো কাজের বিকৃত ব্যাখ্যা পেশ করে। যেমন জিহাদের আলোচনা আনলে আম্মারা বলবে, এটা তো প্রকারান্তরে নিজেকে হত্যার মুখে ঠেলে দেওয়া, স্ত্রীকে বিধবা করা, সন্তানদের এতিম করা এবং ধন সম্পদ নষ্ট করার নাম। তদ্রূপ যাকাত ও দানসদকার বাস্তবতা তুলে ধরবে সম্পদ অকাজে ব্যয় হয়ে হ্রাস হয়ে যাওয়া, নিজের সম্পদ ফুরিয়ে গেলে মানুষের কাছে হাত পাতা এবং ফকির মিসকিন অসহায়দের কাতারে নাম লিখাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অবান্তর যুক্তি দিয়ে। কাজেই আমার নফস কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, আমি তার গোলাম না সে আমার গোলাম, আমাকে সে কোন পথে পরিচালিত করছে এসব বিষয়ের প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ

মুমিনের অন্তরের ওপর নফসে আম্মারার কর্তৃত্ব স্থাপন করা একটি রোগ। এর প্রতিষেধক হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রন করা এবং নিজের নফসের বিরোধিতা করা। শাদ্দাদ বিন আউস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ ওই ব্যক্তি যে স্বীয় নফসের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্ তায়ালার ওপর বৃথা আশা পোষণ করে'। [১]

উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'তোমরা নিজেদের হিসেব নাও জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়ার আগে। নিজেদের ওজন করে নাও ওজনের সম্মুখীন হওয়ার আগে। কেননা কিয়ামতের দিন হিসাব দেওয়ার চেয়ে আজ হিসাব করে নেওয়া তোমাদের জন্য অধিক সহজ। তোমরা সবচেয়ে বড় জমায়েতের জন্য সজ্জিত হয়ে নাও, যেদিন তোমাদের (বিচারের জন্য) উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো কথাই সেদিন গোপন থাকবে না'।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন—'মুমিন তার নিজের নফসের ওপর কর্তৃত্বশীল। সে নিজেকে হিসেব করে আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। বস্তুত কিয়ামতের দিন ওই সমস্ত লোকের হিসেব সহজ হয়ে যাবে, যারা দুনিয়াতে নিজেদের হিসাব নেয়। আর যারা দুনিয়া কাটিয়ে দেয় বিনা

[১] জামে তিরমিজি ২৪৫৯

হিসেবে, কিয়ামতের দিন তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত কঠিন'।

'মুমিন ব্যক্তি আকস্মিক কোনো কিছু দেখলে যদি তার কাছে পছন্দনীয় মনে হয়। তখন সে বলে, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে পেতে চাই, তোমাকে আমার প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে পাওয়ার কোনো রাস্তা রাখেন নি। তাই তোমার মাঝে আর আমার মাঝে বড় একটি প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে'।

'আবার কখনো কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ তার দ্বারা সম্পাদিত হয়ে গেলে সে বলে, এটা আমার কাজ নয়, এই কাজের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর শপথ, আমি আর কখনো এই কাজ করবো না'।

'মুমিনগণ এমন এক জাতি কুরআন যাদের স্থির করে রেখেছে, তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মুমিনরা দুনিয়াতে বন্দীর মতো, নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় সে মগ্ন। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করে না। তারা জানে যে, তাদের কর্ণ, দৃষ্টি, রসনা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবকিছুর ব্যাপারেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং সব কিছুর জন্যই তাদের পাকড়াও করা হবে'।[২]

মালিক বিন দীনার রহিমাহুল্লাহ বলেন—'যে ব্যক্তি তার নফসকে বলে, তুমি কি অমুক কাজ করো নি! তুমি কি অমুক কাজ করো নি! অতঃপর সে তাকে তিরস্কার করে এবং বশীভূত করে। তারপর তার ওপর আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব চাপিয়ে দেয়, ফলে কুরআন হয়ে যায় তার পথপ্রদর্শক সেনাপতি- আল্লাহ্ তায়ালা এমন ব্যক্তির ওপর রহম করুন'।

অতএব আল্লাহ্ তায়ালা ও আখিরাতে বিশ্বাসী সচেতন ব্যক্তির জন্য নিজের হিসাব নিকাশ করা অপরিহার্য। নিজের চালচলন উঠাবসা এবং পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। জীবনের প্রতিটি শ্বাস এক একটি অমূল্য মুক্তা, যা দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী অনেক নিয়ামত খরিদ করা যায়। সুতরাং এই অমূল্য শ্বাসগুলো নষ্ট করা কিংবা তার বিনিময়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা অনেক বড় ক্ষতির বিষয়; কোনো ন্যূনতম জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি এ রকম অপকর্ম করতে পারে না। এর লোকসানের বিষয়টি তার সামনে স্পষ্ট হবে

---

[২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির ৯/২৭২

পুনরুত্থানের দিন,

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا

> 'যেদিন প্রত্যেকেই তার ভালো কাজ উপস্থিত পাবে, তার খারাপ কাজও। সেদিন সে কামনা করবে, যদি তার ও খারাপ কাজের মধ্যে বহুদূর দূরত্ব হতো!'[৩]

আত্মনিয়ন্ত্রণ দুই প্রকার—এক প্রকার কোনো কাজ করার আগে করতে হয়। আরেক প্রকার করতে হয় কোনো কাজ করার পরে।

প্রথম প্রকার হলো, কাজ করার ইচ্ছা কিংবা কল্পনা করার সময় একটু থেমে অপেক্ষা করা। কাজটি করার যোগ্য এবং প্রত্যাখ্যানঅযোগ্য, এ কথা স্পষ্ট হওয়ার আগে কাজটি না করা।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন—'আল্লাহ্ তায়ালা ওই ব্যক্তিকে রহম করুন, যে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে একটু থেমে যায়। যদি তা আল্লাহর জন্য হয়, তাহলে সম্পাদন করে অন্যথায় ত্যাগ করে'।

তাঁর এই কথার ব্যাখ্যা অনেকে এভাবে করেছেন—যখন নফসে কোনো কাজের কথা উদয় হবে এবং ব্যক্তি তা করার ইচ্ছা করবে, তখন সে একটু অপেক্ষা করে দেখবে যে, সে কি এই কাজ করার সামর্থ্য রাখে কি না? যদি সামর্থ্যের বাহিরে হয়, তাহলে তার দিকে অগ্রসর হবে না। আর যদি সামর্থ্যের ভেতরে হয়, তাহলে আরও একবার থেমে যাবে এবং ভেবে দেখবে যে, এই কাজটি করার চেয়ে পরিত্যাগ করা উত্তম নাকি পরিত্যাগ করার চেয়ে সম্পাদন করাই উত্তম? যদি প্রথমটি হয়, তাহলে তা পরিহার করবে। অন্যথায় তৃতীয়বারের মতো একটু দাঁড়াবে এবং আবারও দৃষ্টি দেবে যে, এই কাজের আগ্রহ কি আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি ও প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে নাকি সৃষ্টি থেকে ধন সম্পদ প্রশংসা ও সুনাম অর্জনের লক্ষ্যে? যদি দ্বিতীয়টা হয়, তাহলে তা থেকে বিরত থাকবে, যদিও এর

---

[৩] সূরা আলে ইমরান ৩০

দ্বারা উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়; যেন নফস শিরক এবং গাইরুল্লাহর জন্য আমল করতে অভ্যস্ত না হয়ে যায় এবং এগুলোকে হালকা মনে না করে। কেননা তার কাছে এগুলো যত হালকা মনে হবে, ততই আল্লাহর জন্য আমল করা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি প্রথমটি হয়, তাহলে আরও একবার ভেবে দেখবে যে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এই কাজে কি তাকে সহযোগিতা করা হবে? তার কি অনেক সহযোগী এবং সাথী আছে? যদি তার কোনো সহযোগী ও সাথী না থাকে, তাহলে এই কাজ করবে না। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় থেকে জিহাদ করেন নি, নিজের শক্তি ও সহযোগী গড়ে তোলার জন্য। আর যদি তার সহযোগী থাকে, তখন গিয়ে সে এই কাজ করতে অগ্রসর হবে; কেননা সে আল্লাহর আদেশে বিজয়ী ও সফল। এই চারটি বিষয়ের একটি বিষয় যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সফলতা আসবে না। আর যদি সবগুলোর সমাগম ঘটে, তাহলে সফলতা তার পদচুম্বন করবে। এই চারটি স্থানে বান্দা কাজের পূর্বে নিজেকে হিসাব নিতে মুখাপেক্ষী

দ্বিতীয় প্রকার হলো, কাজের পর নিজের হিসাব নেওয়া। এটা আবার তিন প্রকার—

এক—আল্লাহ্ তায়ালার কোনো ইবাদতে ত্রুটি করলে এবং যেভাবে করা দরকার ছিল সেভাবে করতে না পারলে নফসের হিসাব নেওয়া। কোনো ইবাদতে আল্লাহ্ তায়ালার হক ছয়টি। আর তা হলোঃ কাজের মধ্যে ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা থাকা, সেখানে আল্লাহ্ তায়ালার বশ্যতা থাকা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থাকা, আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহের কথা সাক্ষ্য দেওয়া, নিজের ওপর আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের সাক্ষ্য দেওয়া এবং এতো কিছুর পর সেখানে নিজের ত্রুটির কথা স্বীকার করা। এভাবে সে ভেবে দেখবে যে, সে কি এসমস্ত হক আদায় করতে পেরেছে? কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিতে কি তা সম্পাদন করতে পেরেছে?

দুই—যে সমস্ত কাজ করার চেয়ে পরিহার করা শ্রেয় ছিল, এরূপ প্রতিটি কাজে নিজের জবাবদিহিতা করা।

তিন—কোনো একটি বৈধ কাজ করার পর তা নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করবে,

কেন করেছে কাজটি? আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের জন্য করেছে কি? তাহলে তো সে এতে লাভবান হবে। নাকি দুনিয়া পাওয়ার ইচ্ছা করেছে? তাহলে তো তার লোকসান হয়ে যাবে এবং এই কাজ দিয়ে অর্জনযোগ্য সফলতা তার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

উদাসীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রন না করা, লাগামহীনতা এবং এসবকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করা- এগুলোর কারণে ব্যক্তি হালাকের বিবরে গিয়ে পতিত হয়। প্রবঞ্চিতদের অবস্থাও এমনই। তারা শাস্তি থেকে নিজেদের চোখকে অন্ধ করে নেয় এবং ক্ষমা পাওয়ার আশায় থাকে। ফলে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করে না এবং শেষ ফলাফল নিয়েও ভেবে দেখে না। আর যখন তার এই মনোভাব ধারাবাহিকতা লাভ করে, তখন তার জন্য গুনাহের কাজ করা সহজ হয়ে যায়। সে অপরাধের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়; তার জন্য গুনাহ ও অপরাধ ত্যাগ করা তখন হয়ে যায় প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য।

এসব থেকে উত্তরণের পথ হলো, সর্ব প্রথম নিজেকে ফরজ কাজগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা। যদি কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরন করবে, ক্বাযা কিংবা সংশোধনের দ্বারা। অতঃপর গুনাহের কাজগুলো নিয়ে ভেবে দেখবে। যদি কোনো গুনাহের কথা স্মরণ হয়, তাহলে তওবা ইস্তিগফার এবং নেক কাজের দ্বারা তার খেসারত দেবে। এরপর নিজেকে জিজ্ঞেস করবে উদাসীনতা সম্পর্কে। যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি সেখানে কোনো ঘাটতি দেখা যায়, তাহলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর জিকির করে তার ক্ষতিপূরণ করবে। পরিশেষে নিজের মুখ দিয়ে যে সমস্ত কথা বলেছে, পা দিয়ে যেখানে যেখানে গিয়েছে, হাত দিয়ে যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করেছে এবং কান দিয়ে যা শ্রবণ করেছে সেগুলোর হিসাব নেবে; এসবের পেছনে উদ্দেশ্য কী ছিল, কেন করেছে, কার জন্য করেছে, কোন পদ্ধতিতে করেছে?- এভাবে নিজেকে জবাবদিহিতার অভ্যস্ত করে নেবে।

মুমিন ব্যক্তি সব সময় একটি কথা নিজের করোটিতে খেয়াল করবে যে, প্রতিটি কথা ও পদক্ষেপের জন্য দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে হতে হবেঃ কার জন্য করেছো? কোন পদ্ধতিতে করেছো? প্রথম প্রশ্ন একনিষ্ঠতার

জন্য। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আনুগত্যের জন্য। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ

> 'যাতে তিনি সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন'।[৪]

ভেবে দেখুন, যদি সত্যবাদী তথা আল্লাহ্ তায়ালার বাধ্য অনুগত বান্দাদের নিজেদের সত্যবাদিতার হিসাব দিতে হয়, তাদেরকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে মিথ্যাবাদীদের কী হবে!

আত্মনিয়ন্ত্রণের উপকারিতা

১- নিজের ত্রুটি ও দোষগুলো জানা যায়। যে ব্যক্তি নিজের দোষ সম্পর্কে অবগত নয়, সে তা পরিশুদ্ধও করতে পারে না।

ইউনুস বিন উবাইদ রহিমাহুল্লাহ বলেন—'আমি এমন একশটি ভালো গুণের কথা জানি, আমার নফসের মধ্যে যার একটিও উপস্থিত নেই'। মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি' রহিমাহুল্লাহ বলেন—'যদি গুনাহের কোনো দুর্গন্ধ থাকত, তাহলে কেউ আমার পাশে বসতে পারতো না'।

২- নিজের ওপর আল্লাহ্ তায়ালার হকসমূহ জানতে পারা। এর মাধ্যমে ব্যক্তির মাঝে নিজের নফসের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়। তখন সে তাকে তাচ্ছিল্য করে এবং আত্মম্ভরিতা ও দেখানোপনা থেকে মুক্ত করে। ফলে তার জন্য নিজ রবের সামনে বিনয়, অবনত এবং ঝুঁকে যাওয়ার দ্বার উন্মুক্ত হয়। নিজের নফসের ওপর সৃষ্টি হয় নিরাশা। আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমা, মার্জনা এবং রহমত ছাড়া মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়, এ কথা তার অন্তরে দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্ তায়ালার হক হলো তাঁর বাধ্য হওয়া, অবাধ্য না হওয়া, তাঁকে স্মরণ করা ভুলে না যাওয়া এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া।

অতএব নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা নিজেকে পরিশুদ্ধ এবং অনুগত করার জন্য অতীব জরুরী।

[৪] সুরা আহজাব ৮

সবর

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবর বা ধৈর্যকে বানিয়েছেন হোঁচট না খাওয়া তুরঙ্গম, ভোঁতা না হওয়া তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি, অপরাজেয় বিজয়ী সেনাদল এবং দুর্লঙ্ঘ্য মজবুত দুর্গ। সবর এবং বিজয় দুই সহোদর। আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় কিতাবে ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন। তিনি তাদেরকে বেহিসাব প্রতিদান দিবেন, নিজ হিদায়েত, অমোঘ সহযোগিতা এবং সুস্পষ্ট বিজয় দিয়ে তাদের সুসজ্জিত করবেন, এমন সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ اصْبِرُوْا اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

'তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।'[১]

আল্লাহ্ তায়ালার এই সঙ্গ দ্বারা ধৈর্যশীলগণ দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ অর্জন করতে পারবেন। ঋদ্ধ হতে পারবেন তাঁর প্রকাশ্য গোপনীয় অসংখ্য নিয়ামতে । আল্লাহ্ তায়ালা এই দ্বীনের নেতৃত্ব ন্যস্ত করেছেন ধৈর্য এবং বিশ্বাসের ওপর। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ

'তাদের মধ্য থেকে আমি কিছু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা

[১] সূরা আনফাল ৪৬

> আমার নির্দেশ অনুযায়ী পথ প্রদর্শন করতো, যখন তারা ধৈর্যশীল হয়েছিল। তারা আমার নিদর্শনসমূহের ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতো'।[২]

ধৈর্য, ধৈর্যশীলদের জন্য কল্যাণকর, আল্লাহ্ তায়ালা এই সংবাদ দিয়েছেন খুব জোরালো ভাষায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

> 'তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে অবশ্যই তা ধৈর্যশীলদের জন্য কল্যাণকর।'[৩]

শত্রু যদি খুব প্রতাপশালীও হয়, তবুও তার কোনো ষড়যন্ত্রই ক্ষতি করতে পারবে না, যদি ধৈর্য ও বিশ্বাস থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا اِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ

> 'তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তায়ালা আয়ত্তে রেখেছেন'।[৪]

সফলতাকে জুড়ে দিয়েছেন সবর ও তাকওয়ার সাথে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করো এবং সর্বদা সতর্ক থাকো। আর আল্লাহকে ভয়

[২] সুরা সাজদা ২৪

[৩] সুরা নাহল ১২৬

[৪] সুরা আলে ইমরান ১২০

| করো, তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে'। [৫]

আল্লাহ্ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে নিজের ভালোবাসার সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছেন। এর চেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক আর কি হতে পারে! আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ اللهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

| 'আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন'। [৬]

আল্লাহ্ তায়ালা ধৈর্যশীলদের তিনটি সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রত্যেকটিই কল্যাণকর এবং দুনিয়াবাসির কাছে ঈষণীয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ-١٥٥ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ-١٥٦ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ۟ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

'ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। যারা কোনো বিপদে আক্রান্ত হলে বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'(আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে)। তাদের ওপর রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে করুণারাশি আর অনুগ্রহ এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত'। [৭]

জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ারও একটি অন্যতম মাধ্যম হলো সবর। আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু বলেন—

اِنِّیْ جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوْۤا ۙ اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ

'আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম'। [সুরা মুমিনুন ১১১]

---

[৫] সুরা আলে ইমরান ২০০

[৬] সুরা আলে ইমরান ১৪৬

[৭] সুরা বাকারা ১৫৫-১৫৭

আল্লাহ্ তায়ালার নিদর্শনাবলির ক্ষেত্রে সবরকারি এবং শোকরকারীদের বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন অন্যদের থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার জন্য। কুরআনের চারটি আয়াতে আল্লাহ্ জাল্লা ওয়া আলা বলেন—

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

> 'নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শনাবলি, প্রত্যেক ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য'।[৮]

সবর হলো মুমিনের জন্য নিকায় স্বরূপ। ঘুরে ফিরে সে এখানেই আশ্রয় গ্রহণ করে। মুমিনের ঈমানের স্তম্ভ হলো সবর। যার মাঝে সবরের গুণ নেই, তার ঈমানও নেই; থাকলেও তা নিতান্ত দুর্বল। এমন ঈমান বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করে সন্দেহের ছায়ার মধ্যে থেকে। যদি তার কল্যাণকর কিছু হয়, তাহলে তো সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু যদি যদি তার ওপর কোনো পরিক্ষা আপতিত হয়, তাহলে সে তার আসল চেহারায় ফিরে যায়, কুফরি করে, অভিযোগ উত্থাপন করে এবং বিলাপ করতে থাকে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই হারায়। বিকট ক্ষতির মধ্য থেকে এক চিলতে লাভ অর্জন করে। সুতরাং সফল লোকেরা যে কল্যাণ অর্জন করেছেন, তা নিজেদের সবরের মাধ্যমেই করেছেন। নিজেদের কৃতজ্ঞতার গুণ দ্বারাই তারা উন্নতির শিখর স্পর্শ করতে পেরেছেন। এভাবেই এক সময় সবর ও শোকরের ডানায় ভর করে পৌঁছে যাবেন চির অনিন্দ জান্নাতে। 'এটি আল্লাহ্ তায়ালার একটি অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা পরম অনুগ্রহশীল'।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ঈমানের দুটি ভাগ; সবর ও শোকর। অতএব, যে নিজের কল্যাণকামী, নাজাত পেতে আগ্রহী, সফল হতে উদগ্রীব, সে অবশ্যই এই দুটোকে অবহেলা করবে না। সে অবশ্যই এই দুটোর মাঝে থেকেই জীবন-পথ গমন করবে। তাহলেই আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের বেলায় সবর ও শোকর গুজারদের সঙ্গে এক কাতারে থাকতে পারবে।

---

[৮] সুরা ইবরাহিম ৫; লুকমান ৩১; সাবা ১৯; শূরা ৩৩

সবর; অর্থ ও তাৎপর্য

সবরের শাব্দিক অর্থ হলো, বারণ ও নিয়ন্ত্রণ।

শরীয়তের পরিভাষায় সবর বলা হয়, অন্তরকে অস্থিরতা থেকে, জিহ্বাকে অভিযোগ করা থেকে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গাল চাপড়ানো, বিলাপে কাপড় ফেড়ে ফেলা ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা।

কেউ বলেন, সবর একটি উচ্চাঙ্গের আত্মিক বৈশিষ্ট্য যা ব্যক্তিকে অসুন্দর ও অশোভন কাজ থেকে বিরত রাখে। যুগপৎ নফসকে শুদ্ধ রাখা এবং ন্যায় পথে অবিচল থাকার জন্য একটি প্রাণসঞ্জীবনী।

জুনাইদ বাগদাদি রহিমাহুল্লাহকে সবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—'কোনো ধরণের ভ্রূকুটি ব্যতীত তিক্ত ঔষধ সেবন করার নামই হলো সবর'।

যুন নুন মিশরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা, আপদকালে প্রশান্তচিত্তে যন্ত্রণা গলাধঃকরণ করা এবং রুটিরুজির আঙিনায় অনটন দেখা দিলে সচ্ছলতা প্রদর্শন করা, এই হলো সবর'।

'অভাব অনটনের সময় স্রষ্টার প্রতি অভিযোগ বিহীন সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করা', অনেকে এভাবেও সবরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

একজন আল্লাহ্ওয়ালা এক লোককে দেখলেন, সে তার ভাইয়ের কাছে দারিদ্রতা ও অনটনের অভিযোগ করছে। তিনি তাকে বললেন, 'যিনি রহম করেন তাঁকে ছেড়ে যে রহম করে না তার কাছে অভিযোগ জানিয়েছ, এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারো নি'।

অভিযোগ দুই প্রকার। এক প্রকার হলো, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অভিযোগ জানানো। এটা সবরের বিপরীত নয়। যেমন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, 'আমি আমার দুঃখ ও মনঃকষ্টের অভিযোগ আল্লাহর কাছেই করছি'।[৯] এর পূর্বে তিনি এও বলেছিলেন, 'আমার জন্য এখন ধৈর্য ধরাই শ্রেয়'। [সুরা ইউসুফ]

---

[৯] সুরা ইউসুফ ৮৬

দ্বিতীয় প্রকার হলো, আপদগ্রস্ত ব্যক্তি মুখে কিংবা অভিব্যক্তিতে নিজের অভিযোগ অন্যের কাছে তুলে ধরা। এটা সবরের বিপরীত এবং তাকে বিনষ্ট করে দেয়।

নফস হলো বান্দার বাহন। এতে আরোহণ করে সে জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে যাত্রা করে। এই বাহনের জন্য লাগাম ও বন্ধনী স্বরূপ কাজ করে সবর। যদি বাহনের লাগাম বা নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র না থাকে, তাহলে তা পদে পদে বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার এক ভাষণে বলেছিল, 'তোমরা নফসের দিকে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখো; কেননা তা মন্দের দিকে সহসাই উঁকি মারে। আল্লাহ্ তায়ালা ওই ব্যক্তিকে রহম করুন, যে নিজের নফসের জন্য বানিয়ে নিয়েছে লাগাম, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ্ তায়ালার বাধ্যতার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেছে এবং লাগাম ধরে তাকে আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্যতা থেকে দূরে রেখেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালার আজাবের ওপর ধৈর্য ধরার চেয়ে তাঁর নিষিদ্ধ হারাম কাজ থেকে সংযত থাকা অধিক সহজ'।

নফসের রয়েছে দুটি শক্তি। এক, পদক্ষেপগ্রহণশক্তি। দুই, নিবৃত্তকরণ শক্তি। সবর প্রথম শক্তিকে ব্যক্তির জন্য উপকারী কাজে ব্যয় করে এবং দ্বিতীয় শক্তি দ্বারা ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচিয়ে রাখে। কতো মানুষ আছে এমন, যারা ধৈর্য ধরে রাতভর ইবাদত করে, রোজায় অনাহারের কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু হারাম দৃষ্টিক্ষেপ থেকে নিজেকে সংযত করতে পারে না। আবার কিছু মানুষ আছে এমন, যারা হারাম দৃষ্টিক্ষেপ থেকে তো ধৈর্য ধারণ করে কিন্তু সৎকাজে আদেশদান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধকরণ এবং জিহাদের জন্য সবর করতে পারে না। এখানে এসেই নফসের শক্তি এবং তার ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বিস্তর ফরক নজরে পড়ে।

সবর এবং অস্থিরতা বিপরীত দুটি গুণ। আল্লাহ্ তায়ালা জাহান্নামীদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ

> 'এখন আমরা অস্থির হই কিংবা ধৈর্য ধরি উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের কোনো রেহাই নেই'। [১০]

[১০] সুরা ইবরাহিম ২১

সবরের বিভিন্ন প্রকারভেদ

সবর তার সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে তিন প্রকারঃ এক, আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ ও হুকুমগুলোর ওপর সবর করে তা আদায় করা। দুই, তাঁর নিষেধাজ্ঞা এবং বারণগুলো থেকে বেঁচে থেকে সবর করা। তিন, তাঁর নির্ধারণ এবং ভাগ্যের ওপর সবর করা; কোনো কিছুর জন্য ক্রুদ্ধ না হওয়া।

সবর আবার দুই প্রকারঃ ঐচ্ছিক এবং বাধ্যতামূলক। প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিক সম্পূর্ণ। কেননা বাধ্যতামূলক সবরে মানুষের হাত থাকে এবং যে ঐচ্ছিক সবর করতে পারে না, সেও বাধ্য হয়ে এখানে সবর করতে উদ্যত হয়। পক্ষান্তরে ঐচ্ছিক সবরের বিষয়টি ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন তাঁর ভাইয়েরা কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তিনি তখন সবর করেছিলেন এবং তা ছিল বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে মন্ত্রীর স্ত্রীর কুপ্রস্তাবে রাজি না হয়েও ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং এটি ছিল ঐচ্ছিক। তাই এটির মূল্য ও তাৎপর্য অনেক উন্নত।

মানুষ জীবনের কোনো অবস্থাতেই সবর থেকে বিমুখ কিংবা স্বাধীন হতে পারে না। কেননা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তার সামনে পালনীয় কিছু আদেশ, বর্জনীয় কিছু নিষেধাজ্ঞা, আপতিত কিছু ভাগ্যলিপি এবং শোকরযোগ্য অসংখ্য নিয়ামত বিদ্যমান থাকে। যেহেতু সব সময়েই এই বিষয়গুলো মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, তাই কোনো সময়ই সে সবর থেকে মুক্ত কিংবা উদাসীন হতে পারে না। আমৃত্যু তাকে ধৈর্যের অনুশীলন করেই যেতে হবে।

প্রাত্যহিক জীবনে বান্দা যে সমস্ত অনুষঙ্গের মুখোমুখি হয়, তা দুই অবস্থার যে কোনো এক অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। হয়তো অনুষঙ্গটি তার চাহিদা ও অন্তরের অনুকূলে হবে কিংবা প্রতিকূলে যাবে। উভয় অবস্থাতেই সে সবরের প্রতি মুখাপেক্ষী। কিন্তু তার প্রবৃত্তির অনুকূল অনুষঙ্গ, যেমন সুস্থতা ধনসম্পদ খ্যাতি ইত্যাদি, এক্ষেত্রে সে অধিক হারে সবরের মুখাপেক্ষী। কয়েকটি দিক থেকে তা অপরিহার্য—

১- তার দিকে আকৃষ্ট হতে পারবে না, তা নিয়ে প্রবঞ্চিত হতে পারবে না,

অহমিকা প্রদর্শন করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ তায়ালার অপছন্দনীয় নিন্দিত উল্লাসেও অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

২- তার মধ্যে অবাধে অবগাহন করতে পারবে না।

৩- তার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার হক আদায় করতে হবে।

৪- হারামে তা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

এতোগুলো সবরের উপাদানের দিকে খেয়াল করেই হয়তোবা জনৈক সালাফ বলেছিলেন, 'বিপদ কিংবা পরিক্ষার সময় মুমিন কাফর নির্বিশেষে ধৈর্য ধারণ করে। কিন্তু নিরাপত্তা এবং সাচ্ছন্দের সময় শুধু সত্যবাদীরাই ধৈর্য ধারণ করতে পারে'।

আব্দুর রহমান বিন আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমাদেরকে অনটনের সময় পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি। কিন্তু সচ্ছলতার সময় আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন ধৈর্য ধারণ করতে পারি না'।

এজন্যই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি, স্ত্রীর ফিতনা ও পরিক্ষার ব্যাপারে সাবধান করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

> 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের সম্পদ এবং পরিবার পরিজন যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়'। [১১]

সবরের দ্বিতীয় প্রকার হলো, যা বান্দার চাহিদার বিপরীত কিংবা প্রতিকুল হয়। এক্ষেত্রে কিছু আবার বান্দার ইচ্ছাশক্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকে। সে চাইলে করতে পারে, চাইলে ছাড়তে পারে। যেমন, ইবাদত ও গুনাহের কাজ। অথবা যার সূচনা বান্দার এক্তিয়ারে থাকে না। যেমন, বিপদ আপদ ও বালা মুসীবত।

প্রথম প্রকার—যা বান্দার ইচ্ছাশক্তির সাথে সম্পৃক্ত এবং তার ওপর নির্ভরশীল। ইবাদত কিংবা গুনাহের কাজ বলতে যা কিছু আছে, সবগুলোই

---

[১১] সূরা মুনাফিকুন ৯

এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। ইবাদতের ক্ষেত্রে বান্দা সবরের মুখাপেক্ষী; কেননা নফস স্বাভাবিকভাবেই অধিক ইবাদত করা থেকে দূরে থাকতে চায়, পছন্দ করে না। নামাযের মধ্যে অলসতা এসে ভিড় জমায়, আরাম তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। এর সাথে যদি তার অন্তর হয় কঠোর, গুনাহের কারণে মরীচিকাময়, প্রবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট এবং গুনাহগারদের সাহচর্যে অভ্যস্ত, তাহলে তো নামায আদায় করতে তার পাহাড় সম ধৈর্যের প্রয়োজন।

তদ্রূপ জাকাতের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। নফসের প্রকৃতিই হলো কৃপণতা করা, খরচ করতে না চাওয়া। অনুরূপ হজ জিহাদ ইত্যাদি সমস্ত ইবাদতের মধ্যেই সবরের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তবে বান্দা ইবাদতের ক্ষেত্রে তিন ধাপে সবরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে—

এক, ইবাদত শুরু করার পূর্বে। তখন তাকে নিয়ত পরিশুদ্ধ করতে হয়, ইবাদতের মধ্যে একনিষ্ঠতা আনতে হয়।

দুই, ইবাদত শুরু করার সময়। এসময় সবধরনের ত্রুটি বিচ্যুতিকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়, সৎনিয়তের সঙ্গ থাকতে হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাশাপাশি কলবকেও আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে সঁপে দিতে হয়। সবর ছাড়া এসব করা অসম্ভব।

তিন, ইবাদত শেষ করার পর। এখন তাকে এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা দ্বারা তার কৃত ইবাদত বাতিল হয়ে যেতে পারে। বস্তুত ইবাদত সম্পাদন করার চেয়ে তাকে বিনাশের হাত থেকে বাঁচানো অধিক কষ্টকর এবং মূল্যবান। তাই তাকে অহমিকা, লোকদেখানো এবং বড়াই থেকে বিরত থাকতে হবে। অনুরূপ গোপনীয়তার দফতর থেকে প্রকাশ্যের দফতরে সরবরাহ করার ক্ষেত্রেও সবর করতে হবে। কেননা বান্দা তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে গোপন এক মূর্ছনায় ইবাদত করে এবং তা গোপন এক দপ্তরে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু যখন সে তা অন্যের কাছে ব্যক্ত করে কিংবা প্রকাশ্যে নিয়ে আসে, তখন তা সেই গোপন দপ্তর থেকে প্রকাশ্য দপ্তরে চলে আসে এবং মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই আমল ও ইবাদত শেষ করলেই সবরের চাদর গুটিয়ে নেওয়া যাবে, এমন ধারণা থেকে নিরাপদে থাকতে হবে।

পক্ষান্তরে গুনাহের ক্ষেত্রে সবর করার বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। কেননা এর জন্য অনেক বাঞ্ছিত বস্তু পরিত্যাগ করতে হয়। অনেক প্রিয় কাঙ্ক্ষিত জিনিস ও ব্যক্তির সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।

দ্বিতীয় প্রকার—যা বান্দার এক্তিয়ারের আওতাভুক্ত নয় এবং তা প্রতিরোধে তার কোনো কৌশলই কার্যকর নয়। যেমন বিপদ আপদ। এটা হয়তো এমন হতে পারে যাতে মানুষের কোনো হাত নেই। যেমন, মৃত্যু কিংবা অসুস্থতা। আবার মানুষেরও সেখানে অংশীদারি থাকতে পারে। যেমন, গালিগালাজ এবং মারধর ইত্যাদি।

প্রথম সূরতে বান্দার চারটি স্তর হতে পারেঃ ১- অক্ষমতা; অস্থিরতা এবং অভিযোগ দ্বারা যা প্রকাশ পায়। ২- সবর। ৩- মেনে নেওয়া। ৪- শুকরিয়া আদায় করা; বিপদকে নিয়ামত জ্ঞান করে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আর যে সমস্ত বিষয়ে মানুষের অংশীদারি থাকে, সেখানেও বান্দার মাঝে উপরোক্ত চারটি স্তর হতে পারে। তবে এখানে আরও চারটি যুক্ত হয়ঃ ১- ক্ষমা করে দেওয়া। ২- ক্রোধ ভুলে অন্তরকে নির্মল করে ফেলা। ৩- ভাগ্যের লিখন হিসেবে মেনে নেওয়া। ৪- জুলুমকারীর সাথে উত্তম আচরণ করা।

সবরের ফজিলতে বর্ণিত হাদিস সমূহ

উম্মে সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে—

> ‘কোনো মুসলমান যদি বিপদে আক্রান্ত হয়ে বলে, ‘আল্লাহ্ তায়ালা যা আদেশ করেছেন তাই হয়েছে। বস্তুত আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হে আল্লাহ্, আমাকে আমার বিপদের প্রতিদান দিন এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন’- তাহলে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করবেন’।

উম্মে সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যখন (আমার স্বামী) আবু সালামা

মারা গেলো আমি মনে মনে বললাম, আবু সালামার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি আর কে হতে পারে? তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হিজরত করে পৌঁছে ছিলেন। তারপর আমি উপরোক্ত কথাগুলো বললাম। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমায় বিনিময় হিসেবে দান করলেন। [১২]

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—"আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোনো প্রিয় বস্তু দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেই আর সে প্রতিদানের আসায় ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোনও প্রতিদান নেই"। [১৩]

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মুমিন ব্যক্তির যে কোনও বিপদআপদ আসুক, এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা তার পাপ মোচন করেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় তার দ্বারাও!'

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> 'মুমিন নরনারীর শরীরে, সম্পদে কিংবা সন্তানসন্ততিতে বিপদআপদ আসতেই থাকে এবং এভাবেই সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে। তখন তার কোনও গুনাহই আর অবশিষ্ট থাকে না'। [১৪]

খাব্বাব বিন আরাত্ত রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলাম। তিনি তখন কাবার ছায়ায় নিজ চাদরে মাথা রেখে বিশ্রাম করছিলেন। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? তিনি বললেন—

[১২] সহিহ মুসলিম ২০১১
[১৩] সহিহ বুখারি ৬৪২৪
[১৪] সহিহ বুখারি ৫৬৪০

> ‘তোমাদের পূর্বের লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের পাকড়াও করে তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়া হতো, তাদের সেখানে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তাদের মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হতো, লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরের হাড় ও মাংস ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলা হতো- তবুও তাদেরকে দ্বীন থেকে এক পা নাড়ানো যেতো না। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ তায়ালা এই দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখন একা একজন আরোহী সানয়া থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত সফর করবে, আল্লাহ্ ছাড়া এবং তার মেশপালের জন্য নেকড়ে ছাড়া কাউকে ভয় করবে না; কিন্তু তোমরা অনেক তাড়াহুড়ো করছো’। [১৫]

জনৈক সালাফ বলেন, ‘যদি দুনিয়ার জীবনে বালা মুসীবত না থাকতো, তাহলে আমরা আখিরাতে পদার্পণ করতাম রিক্তহস্তে’ ।

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী, ‘আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী পথ প্রদর্শন করতো, যখন তারা ধৈর্যশীল হয়েছিল। তারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতো’।[১৬] এই আয়াতের প্রেক্ষিতে সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যখন তারা আদেশ অনুযায়ী চলা শুরু করেছে, আমি তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিয়েছি’।

আবার যখন লোকেরা উরওয়া বিন যুবাইর রদিয়াল্লাহু আনহুর পায়ে ব্যাধি দেখা দিলে লোকেরা তার পা কাটতে চাইলো, তখন তারা তাকে বলল, আপনি যেন ব্যাথা অনুভব না করেন এজন্য আপনাকে কিছু ঔষধ পান করিয়ে দিই? তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আমাকে আল্লাহ্ তায়ালা পরিক্ষা করছেন আমার সবর যাচাই করার জন্য। আমি কি তাঁর কাজে বাধা প্রধান করবো!’

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ্ তায়ালা কোনও বান্দাকে কোনও নিয়ামত দিয়ে তা ছিনিয়ে নিয়ে যদি তদস্থলে সবর দান করেন, তাহলে ছিনিয়ে নেওয়া জিনিষের চেয়ে বিনিময়টাই অধিক উত্তম’।

---

[১৫] সহিহ বুখারি ৩৬১২

[১৬] সুরা সাজদা ২৪

আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহু একবার অসুস্থ হলেন। লোকেরা তাঁর শুশ্রূষা করতে গিয়ে বলল, আপনার জন্য ডাক্তার ডাকবো? তিনি বললেন, 'ডাক্তার আমাকে দেখেছে'। তারা বলল, আপনার ব্যাপারে তাহলে সে কী বলেছে? তিনি বললেন, 'ডাক্তার বলেছেন, আমি যা ইচ্ছা তাই করি'।

বর্ণিত আছে যে, সাইদ বিন জুবাইর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'বিপদে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার জন্য স্বীকৃতি দেওয়া, তার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিদান এবং সওয়াবের আশা রাখা, এটাই সবর। কখনো বান্দা অনেক অস্থির হয়ে পড়ে, তথাপি সে দৃঢ় অবিচল থাকে, তখন তার মাঝে শুধু সবরই পরিলক্ষিত হয়'।

বিপদে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার জন্য স্বীকৃতি দেওয়া এই কথা দ্বারা কেমন যেন 'ইন্না লিল্লাহ'এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা স্বীকৃতি দেবে যে, সে আল্লাহ্ তায়ালার সম্পদ, মালিক সেখানে যা ইচ্ছা তসরুফ করতে পারেন। পক্ষান্তরে তার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিদান এবং সওয়াবের আশা রাখা এ কথা দ্বারা 'ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তার কাছেই ফিরে যাবো এবং তাঁর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করবো, তিনি আমাদের সবরের প্রতিদান দান করবেন, ধৈর্যের ফল দেবেন; তিনি বিপদের প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না।

শোকর বা কৃতজ্ঞতা

শোকর বলা হয়, দানকৃত কল্যাণের জন্য নেয়ামত দাতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

বান্দার শোকর আদায়ের জন্য তিনটি উপাদান প্রয়োজন। এক সঙ্গে তিনটির সম্মেলন ব্যতীত শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব নয়। এক, আন্তরিকভাবে নিয়ামতের স্বীকৃতি দেওয়া। দুই, প্রকাশ্যে তা নিয়ে আলোচনা করা এবং তৃতীয় হলো এই নিয়ামতকে আল্লাহ্ তায়ালার বাধ্যতার কাজে ব্যয় করা বা তার সহযোগিতা নেওয়া।

সুতরাং শোকরের সম্পর্ক একাদিক্রমে অন্তর, জিহ্বা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে। অন্তর হলো ভালোবাসা স্বীকৃতি এবং পরিচয়ের জন্য। জিহ্বা দ্বারা প্রশংসা ও স্তুতি গাওয়া হয়। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে নিয়ামতকে ভালো কাজে ব্যয় করতে হয় এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এই তিনের সম্মেলনেই শোকরের ষোল কলা পূর্ণ হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা শোকরকে ঈমানের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন যে, বান্দা যদি তাঁর ওপর ঈমান স্থাপন করে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, তাহলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কোনও প্রয়োজন তাঁর নেই। কুরআনে কারিমে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَ اٰمَنْتُمْ

। 'তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও ঈমানদার হও, তাহলে।

আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন কেন?' [১]

যারা কৃতজ্ঞ বান্দা, শোকর গোজার, তারা আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য বিশিষ্ট হিসেবে পরিগণিত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

وَ كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْا اَهٰۤؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ

'এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা যেন বলে যে, এরাই কি ওই সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন?' [২]

আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের দুই ভাগে ভাগ করেছেন। কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ। অকৃতজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞ লোকেরাই তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। আর সবচেয়ে পছন্দের হলো কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞ বান্দাগণ। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ সম্পর্কে বলেন—

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا

'আমি তাকে রাস্তা দেখিয়েছি। সে হয়তো কৃতজ্ঞ হবে কিংবা অকৃতজ্ঞ'। [৩]

অন্যত্র বলেন—

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

'স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করেছিলেন, যদি

[১] সুরা নিসা ১৪৭
[২] সুরা আনআম ৫৩
[৩] সুরা ইনসান ৩

তোমরা কৃতজ্ঞ থাকো তাহলে তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেবো। কিন্তু যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে (মনে রেখো) অবশ্যই আমার শাস্তি বড় কঠোর। [৪]

অতএব আল্লাহ্ তায়ালা নিয়ামত বৃদ্ধির ভার রেখেছেন শোকরের ওপর। শোকরের যেমন কোনও সমাপ্তি নেই তেমনি তাঁর নিয়ামতের প্রবৃদ্ধিরও কোনও সীমানা নেই। আল্লাহ্ তায়ালা অনেক দান প্রতিদানকে নিজের চাহিদা ও ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন—

فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَآءَ

'আল্লাহ্ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন'। [৫]

অনুরূপ ক্ষমার ক্ষেত্রে বলেন,

وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ

'তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন'। [৬]

তদ্রুপ তাওবার ক্ষেত্রে বলেন—

وَ يَتُوْبُ اللهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ

'আল্লাহ্ যার ইচ্ছা তাওবা কবুল করেন'। [৭]

শোকরের প্রতিদান কী হবে, আল্লাহ্ তায়ালা তা নির্দিষ্ট করে দেন নি; বরং রেখেছেন সাধারণ অনির্দিষ্ট, যা অমোঘ কিছু হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেন—

وَ سَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ

[৪] সুরা ইবরাহিম ৭

[৫] সুরা তাওবা ২৮

[৬] সুরা মাইদা ৪০

[৭] সুরা তাওবা ১৫

| 'আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবো'।[৮] |

আল্লাহ্ তায়ালার শত্রু ইবলিস। সে শোকরের সমুন্নত মর্যাদা এবং কৃতজ্ঞদের সম্মানিত অবস্থানের কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল বিধায় তার চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়েছে, মানুষকে শোকর থেকে দূরে রাখা। সে বলেছে—

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ

| 'অতঃপর আমি তাদের ওপর আক্রমণ করবো তাদের সামনের দিকে থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাম দিক থেকে। এবং আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না।[৯] |

কৃতজ্ঞ বান্দাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন—

وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

| 'আমার খুব স্বল্প সংখ্যক বান্দাই কৃতজ্ঞ'।[১০] |

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা এতো পরিমাণ ইবাদত করতেন যে, তাঁর পা মোবারক ফেটে যেতো। একবার তাকে বলা হলো, আপনি এতো ইবাদত করেন, অথচ আল্লাহ্ তায়ালা আপনার পূর্বাপরের যাবতীয় ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন—

| 'আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না'![১১] |

---

[৮] সুরা আলে ইমরান ১৪৫

[৯] সুরা আ'রাফ ১৭

[১০] সুরা সাবা ১৩

[১১] সহিহ বুখারি ৪৮৩৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াজ রদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন,

> 'হে মুয়াজ, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রতি সালাতের পর তুমি এই দোয়া করতে ভুলো না—'আল্লাহুম্মা আয়িন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা' (হে আল্লাহ্, আপনার যিকির, শোকর এবং যথার্থ ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন)।[১২]

শোকর হলো নেয়ামতের জন্য কয়েদ কিংবা তালা স্বরূপ এবং এর দ্বারাই তার প্রবৃদ্ধি ঘটে। উমর বিন আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহর নিয়ামতগুলো আবদ্ধ করে ফেল তাঁর কৃতজ্ঞতা দ্বারা।

আলী রদিয়াল্লাহু আনহু হামযানের এক লোককে বলেছেন, 'নিয়ামত পৌঁছে শোকরের দ্বারা। শোকর বৃদ্ধি করে দেয় নিয়ামতকে। শোকর এবং প্রবৃদ্ধি এক সুতোয় গাঁথা। তাই যতদিন বান্দা থেকে শোকর বিচ্ছিন্ন না হয় আল্লাহ্ তায়ালা থেকেও প্রবৃদ্ধি বন্ধ হয় না'।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তোমরা বেশি বেশি আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতগুলোর কথা আলোচনা করো; কেননা সেগুলোর আলোচনাও শোকরেরই অংশ। আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় নবীকে তাঁর রবের নিয়ামতের কথা ব্যক্ত করতে বলেছেন। 'আর আপনার রবের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ্যে বলুন'।[১৩]

আমর বিন শুয়াইব রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছন—

> 'আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নিয়ামতের চিহ্ন বান্দার ওপর দেখতে পছন্দ করেন'।[১৪]

অর্থাৎ যাকে যে রকম নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে, সে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, এটাই আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দনীয়।

[১২] সুনানে আবু দাউদ ১৫২২

[১৩] সুরা দুহা ১১

[১৪] জামে তিরমিজি ২৮১৯

আবুল মুগিরা রহিমাহুল্লাহকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো যে, হে আবু মুহাম্মাদ, কেমন কাটছে আপনার দিন? তিনি বলতেন, 'দিন কাটছে আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতে ডুবে, শোকর আদায়ে ব্যর্থ অবস্থায়। আমাদের রব আমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী, তবুও তিনি আমাদের কাছে প্রিয় হতে চান। আর আমরা তাঁর কাছে অপ্রিয় হয়ে যাই, যদিও আমরা তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী'।

শুরাইহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনও বান্দার ওপর বিপদ আপতিত হলে তার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার তিনটি অনুগ্রহ থাকে। এক, বিপদটা তার দ্বীনের ওপর না আসা। দুই, এর চেয়ে বড় কোনও বিপদ আসে নি। তিন, এটা হওয়া অপরিহার্য ছিল, তাই এখনি হয়ে গেলো।

ইউনুস বিন উবাইদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এক লোক আবু গুনাইমাকে বলল, আপনার সকাল কেমন হলো? তিনি বললেন, 'আমার সকাল হলো দুটি নিয়ামতের মাঝে, আমি জানি না কোনটা উত্তম। এক, আমার অনেক গুনাহ রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তা গোপন করে রেখেছেন। ফলে কেউ সে ব্যাপারে আমাকে নিন্দা কিংবা তিরস্কার করতে পারে না। দুই, আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের অন্তরে আমার ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন, আমার আমল যে স্তরে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট নয়'।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ

> 'আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে তাদেরকে আমি ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করবো যে, তারা জানতেও পারবে না'।[১৫]

উক্ত আয়াতের তাফসিরে সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ওপর প্রচুর নিয়ামত দান করবেন অতঃপর তাদেরকে শুকরিয়া আদায় করা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা থেকে বঞ্চিত করে দেবেন। এভাবেই তারা আজাবের দিকে এগিয়ে যাবে'।

---

[১৫] সুরা আ'রাফ ১৮২

অনেকে এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'তারা যখনই কোনও গুনাহ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্য একটি নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেবেন। নিয়ামতের শোকর আদায় না করে তারা গুনাহ করতেই থাকবে এবং এক পর্যায়ে আজাবে পতিত হয়ে যাবে।

এক ব্যক্তি আবু হাজিম রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো, আবু হাজিম, চক্ষুদ্বয়ের শোকর কি? তিনি বললেন, ভালো কিছু দেখলে তা প্রকাশ করবে আর মন্দ কিছু দেখলে তা গোপন রাখবে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কর্ণদ্বয়ের শোকর কি? তিন বললেন, ভালো কিছু শ্রবণ করলে তা মুখস্থ করবে আর যদি মন্দ কিছু শ্রবণ করো তাহেল তা ঝেড়ে ফেলে দেবে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, তাহলে হস্তদ্বয়ের শোকর কি? তিনি বললেন, তার মালিকানাধীন নয় এমন কিছু তা ধারা স্পর্শ করবে না আবার তার হক থেকে তাকে বঞ্চিতও করবে না। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে উদরের শোকর কি? তিনি বললেন, তার নিম্নাংশ হবে খানা এবং উর্ধ্বাংশ হবে ইলম ও জ্ঞানের স্থান। সে বলল, লজ্জাস্থানের শোকর কি? তিনি বললেন, এর উত্তর তো আল্লাহ্ তায়ালাই দিয়েছেন—

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ

'আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসিদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কিন্তু এর বাইরে (অন্যদের) কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে'।[১৬]

তাহলে পায়ের শোকর কি?, সে জিজ্ঞেস করলো। তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমার জ্ঞাতসারে কোনও এমন মৃত ব্যক্তি থাকে, যাকে তুমি ঈর্ষা করো, তাহলে তোমার পা দুটোকে তার মতো কাজে ব্যয় করো। (অর্থাৎমৃত

[১৬] সুরা মুমিনুন ৫-৭

আল্লাহ্ ওয়ালারা যেমন কাজ করে গেছেন, তুমিও তাদের মতো আমল করো, নিজের পা দুটোকে ইবাদতের দিকে গমন করাও।) আর যদি কাউকে ঘৃণা করো, তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে তার মতো কাজ করা থেকে বিরত থাকো। বস্তুত যে লোক জবানে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে কিন্তু তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা করে না, তার উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির ন্যায় যার একটি কাপড় আছে, সে তার এক দিক হাতে নিয়েছে কিন্তু পরিধান করে নি; এই কাপড় তাপে ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে কুয়াশায় তার কোনও কাজে আসবে না। ঠিক তেমনি শুধু মুখের শোকর তার জন্য উপাদেয় হবে না।

জনৈক আলিম তার ভাইয়ের কাছে নিম্নোক্ত পত্র লিখে প্রেরণ করেছেন, ‘পর কথা, আমরা অধিক হারে আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী করি, তথাপি তার অগণিত নিয়ামতে ডুবে আছি। আমার জানা নেই কীসের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করবো; যে সমস্ত ভালো কাজের তিনি তাওফিক দিয়েছেন তার জন্য নাকি ঘৃণিত যে কাজগুলো তিনি গোপনে রেখেছেন তার জন্য?!’

তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্ নির্ভরতা

তাওয়াক্কুলঃ পার্থিব অপার্থিব সমস্ত কাজে লাভ অর্জন এবং ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সত্য দিলে আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ভরসা রাখার নাম হলো তাওয়াক্কুল।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا-٢ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

> ‘যে আল্লাহেক ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য (সংকট থেকে) বের হওয়ার পথ করে দেবেন এবং তাকে অভূতপূর্ব উৎস থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করে দেবেন। আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।[১]

সুতরাং যার মাঝে তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের সম্মেলন ঘটবে, তার দুনিয়া আখিরাত নিয়ে আর কোনো চিন্তা করতে হবে না; এগুলোই তার জন্য যথেষ্ট।

উমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> ‘যদি তোমরা আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা করতে, তাহলে তিনি

[১] সুরা তালাক ৩-৪

তোমাদের সেভাবে রিজিক দান করতেন, যেভাবে পাখিদের রিজিক দান করেন; এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরপেটে ফিরে আসে। [২]

ইমাম আবু হারিম রাযি রহিমাহুল্লাহ বলেন—'উক্ত হাদিস তাওয়াক্কুলের মূল তাৎপর্য বর্ণনা করে দিয়েছে। তাওয়াক্কুল রিজিক আনয়নের সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম'।

সাইদ বিন জুবাইর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'তাওয়াক্কুল হলো ঈমানের মূল'।

তবে আল্লাহ্ তায়ালা যে সমস্ত উপায় কিংবা বস্তুর ওপর বিভিন্ন জিনিষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার পরিচিত নিয়মানুযায়ী মাধ্যম গ্রহণ করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন, তা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয়। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁর ওপর ভরসা করার পাশাপাশি মাধ্যম গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে উপায় ও মাধ্যম গ্রহণ করার জন্য প্রচেষ্টা করাও আল্লাহ্ তায়ালার একটি ইবাদত। আর অন্তর দিয়ে তাঁর ওপর ভরসা করার নাম হলো ঈমান তথা বিশ্বাস। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ

। 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো'। [৩] ।

সাহল রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে চেষ্টা করা এবং উপার্জন করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে সে সুন্নাহ মানার ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে। আর যে তাওয়াক্কুলের মধ্যে ত্রুটি করবে তার ঈমানের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি হবে'।

সুতরাং তাওয়াক্কুল হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত অবস্থা। আর কাজ করা হলো তাঁর সুন্নাহ। অতএব যে তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করবে, সে কখনো কাজ কর্ম ছেড়ে বসে থাকবে না।

---

[২] জামে তিরমিজি ২৩৪৪

[৩] সুরা নিসা ৭১

কেউ কেউ বলেছেন—'উপায় ও মাধ্যম গ্রহণ না করলে তা শরীয়তের ওপর আঘাত হানার সমান। আবার কেউ যদি শুধু উপায় মাধ্যম ও বস্তুর ওপর বিশ্বাস জমিয়ে ফেলে, তাহলে সেটা হবে একত্ববাদের ওপর আঘাত'।

বান্দা যে সমস্ত কাজ করে সাকুল্যে তা তিন প্রকার

প্রথম প্রকার—আল্লাহ্ তায়ালা যে সমস্ত ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন এবং যেগুলোকে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যম বানিয়েছেন। এ সমস্ত কাজ অবশ্যই করতে হবে। তবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রাখতে হবে এবং তাঁর কাছেই সহযোগিতা চাইতে হবে। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ সুবহানাহু যা চাইবেন তা হবেই হবে। আর তিনি যা চাইবেন না, তা কস্মিনকালেও হবে না। অতএব যে এসমস্ত কাজ সম্পাদন করতে কোনো প্রকার ত্রুটি করবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তাকদিরের ভিত্তিতে শাস্তির সম্মুখীন হবে।

ইউসুফ বিন আসবাত রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বলা হয়, আমল করো ওই ব্যক্তির ন্যায়, আমল ব্যতীত যার মুক্তির কোনো পথ নেই। আর তাওয়াক্কুল করো ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে তার ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই পাবে'।

দ্বিতীয় প্রকার—দুনিয়ার জীবনে যা আভ্যাসিক ও স্বাভাবিক এবং আল্লাহ্ তায়ালা নিজ বান্দাদের যা গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন, ক্ষুধা লাগলে আহার করা, তৃষ্ণা লাগলে পান করা, রৌদ্রতাপ থেকে ছায়া গ্রহণ করা, শীতের কুয়াশা থেকে তাপ গ্রহণ করা ইত্যাদি। এ সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির জন্য তার মাধ্যম গ্রহণ করা ওয়াজিব ও অপরিহার্য। যদি কেউ তা ব্যবহার করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ত্রুটি করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সেও সীমালঙ্ঘনকারী এবং শাস্তির উপযুক্ত।

তৃতীয় প্রকার যে সমস্ত কাজের জন্য দুনিয়ায় আল্লাহ্ তায়ালা সাধারণ অভ্যাস তৈরি করে দিয়েছেন এবং তাঁর কোনো বান্দা চাইলে এই অভ্যাস লঙ্ঘনও করতে পারে। যেমন ঔষধ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম দ্বিমত পোষণ করেন যে, কেউ রোগাক্রান্ত হলে, তার জন্য ঔষধ গ্রহণ করা উত্তম নাকি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল সাব্যস্ত করার জন্য তা পরিহার

করা উত্তম?

এখানে দুটি প্রসিদ্ধ অভিমত আছে। তবে ইমাম আহমদের মত হলো, যে সক্ষম তার জন্য তাওয়াক্কুল করাই উত্তম। কেননা ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে,

> আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হলো সে সব লোক, যারা মন্ত্র পাঠ করে না, পাখির মাধ্যমে কোনো কাজের ভালো মন্দ নির্ণয় করে না এবং আগুন দিয়ে দাগ লাগায় না; বরং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে থাকে।[৪]

পক্ষান্তরে যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম চিকিৎসা গ্রহণকে প্রাধান্য দিয়েছেন তারা বলেন, এটা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারাবাহিক আমল। আর তিনি সব সময় উত্তমের ওপরই আমল করে থাকেন।

আর উপরোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় তারা বলেন, উক্ত হাদিসে নিষিদ্ধ ঝাড়ফুঁকের কথা বলা হয়েছে, যেখানে শিরকের আশংকা আছে। এর দলিল হলো, উক্ত হাদিসে ঝাড়ফুঁকের পাশাপাশি দাগ লাগানোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা তো মাকরুহ। অতএব যেহেতু একই সাথে আলোচনা আনা হয়েছে তাই এটিও নাজায়েজ হবে না।

মুজাহিদ ইকরিমা নাখয়ি এবং আরও অনেক সালাফ (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেন যে, একেবারে উপায় ও মাধ্যম ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, তবে শুধু ওই ব্যক্তিকেই দেওয়া যাবে, যার অন্তর পরিপূর্ণভাবে মাখলুকের দিকে ধাবিত হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে।

ইসহাক বিন রাহুয়াহ রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, কারও জন্য কি পাথেয় অস্ত্র সরঞ্জাম ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া জায়েজ হবে? তিনি বললেন, সে যদি আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের মতো ব্যক্তি হয়, তাহলে সে অস্ত্র সরঞ্জাম ছাড়াই যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারে। অন্যথায় এভাবে যাওয়ার অনুমতি তার নেই।

---

[৪] সহিহ বুখারি ৫৭০৫

আল্লাহ্ তায়ালার ভালোবাসা

আল্লাহ্ তায়ালার ভালোবাসা, সবচেয়ে উন্নত মর্যাদা এবং চূড়ান্ত স্তর। ভালোবাসা অর্জন হয়ে গেলে এর চেয়ে উন্নত কোনো অবস্থান নেই। আগ্রহ, ঘনিষ্ঠতা, সন্তুষ্টি ইত্যাদি যা কিছু আছে সবই ভালবাসারই কোনো ফল এবং অনুগত বিষয়। তদ্রূপ ভালোবাসার আগেও কোনো স্থান নেই। তাওবা সবর যুহদ ইত্যাদি এসব তো এর ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট মাত্র।

সবচেয়ে উপকারী, উন্নত, সমুজ্জ্বল ও কার্যকর ভালোবাসা হলো ওই ব্যক্তির ভালোবাসা, যার অন্তর আল্লাহর ভালোবাসায় টইটম্বুর এবং তার প্রকৃতি আল্লাহ্ তায়ালাকে স্রষ্টা ও ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়েছে। কেননা স্রষ্টা ও প্রভু তো তিনিই, যাকে অন্তরসমূহ ভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা, বিনয়, আনুগত্য ও দাসত্ব দ্বারা প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইবাদত ও দাসত্ব আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্য হতে পারে না। আর এই দাসত্বই বিনয় ও আনুগত্যের পূর্ণতার পাশাপাশি ভালোবাসারও পূর্ণতা দান করে।

আল্লাহ্ তায়ালার সত্ত্বা সর্বদিক থেকে প্রেমময়। অন্য সব কিছু তার প্রেমের অনুগামী হয়ে প্রেম লাভ করে। আল্লাহ্ তায়ালার নাযিলকৃত সমস্ত কিতাবেই তাঁর ভালোবাসার কথা অকাট্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাবৎ নবী রাসূলগণ এর দাওয়াত দিয়েছেন নিজ নিজ উম্মতকে। আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের এই প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে বিবেক দান করেছেন, অজস্র নেয়ামত দান করেছেন, নিজ ভালোবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্যই। কেননা

সাধারণ অনুগ্রহকারী এবং করুণাময়ের জন্য ভালোবাসা ও প্রেম লালন করা অন্তরসমূহের একটি বিবর্তনময় প্রকৃতি। তাহলে যিনি সর্বদিক থেকে অনুগ্রহশীল, যিনি সমস্ত নিয়ামতের অদ্বিতীয় স্রষ্টা এবং একচ্ছত্র দাতা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ কী পরিমাণ হতে পারে তা কল্পনাতীত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ

‘তোমাদের কাছে যে নেয়ামত রয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আবার যখন তোমরা কোনো কষ্টে পড় তখন তাঁর কাছেই ফরিয়াদ করো’।[১]

আল্লাহ্ তায়ালার আসমায়ে হুসনা থেকে, মহিমাময় গুণাবলী থেকে এবং তাঁর সৃষ্টির নিদর্শনাবলী থেকে তাঁর যে পরিপূর্ণতা, বড়ত্ব, মর্যাদা ও সম্মান বান্দার সামনে স্পষ্ট হয়, এর দ্বারা প্রেম আরও গাঢ় হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

‘কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহকে ছাড়া (তাঁর) কতিপয় সমকক্ষেও মান্য করে, যাদেরকে তারা আল্লাহকে ভালোবাসার মতই ভালোবাসে। পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা আরও দৃঢ়তর।[২]

অন্যত্র বলেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه فَسَوْفَ يَاْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَه اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ

[১] সূরা নাহল ৫৩
[২] সূরা বাকারা ১৬৫

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে, তাদের স্থলে আল্লাহ্ এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি নরম আর কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে এবং তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে ও কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হবে না'। [৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত কসম করে বলেছেন—

কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তিনি তার কাছে অধিকতর প্রিয় হন নিজ সন্তান, পিতা ও তাবৎ মানুষ থেকে। [৪]

অন্য হাদিসে উমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

তোমার কাছে আমি তোমার প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয় না হলে তুমি সত্যিকারে মুমিন হতে পারবে না। (অর্থাৎ তোমার ভালোবাসা ওই পর্যায়ে না পৌঁছলে তোমার ঈমান কার্যকরী হবে না।)[৫]

এখন ভাবার বিষয় হলো, যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে নিজ আত্মার চেয়ে বেশি প্রিয় হন, নিজের যাবতীয় অনুষঙ্গ থেকে অধিক ভালোবাসার পাত্র হন, তাহলে কি মহামহিয়ান প্রভু তাঁর চেয়ে আমাদের ভালোবাসা ও ইবাদতের বেশি হকদার হবেন না!

বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার যাবতীয় দান তাকে আল্লাহর ভালোবাসার প্রতি আহ্বান করে; চাই তা বান্দার পছন্দনীয় হোক বা অপছন্দনিয়। আল্লাহ্ তায়ালার দান ও নিষেধাজ্ঞা, নিরাপত্তা ও বিপদ, বিস্তৃতি ও সঙ্কীর্ণতা, ন্যায় ও অনুগ্রহ, মৃত্যুদান ও জীবিতকরণ, দয়া ও দানশীলতা, করুণা ও গুনাহ ঢেকে রাখা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা, বান্দার ওপর সংযম, তার প্রার্থনার সাড়া দেওয়া, তার বিপদ দূর করা, তৃষ্ণা নিবারণ করা, সংকট নিরসন করা- বান্দার প্রয়োজনে হোক বা সর্বদিক থেকে অমুখাপেক্ষিতার কালে হোক,

[৩] সুরা মাইদা ৫৪
[৪] সহিহ মুসলিম ৭৩
[৫] সহিহ বুখারি ৬৬৩২

এসব কিছু অন্তরসমূহকে আল্লাহর দাসত্ব ও ভালোবাসার দিকে আহ্বান ও উদ্বুদ্ধ করে। কোনো সৃষ্টি অপর সৃষ্টির প্রতি কোনো করুণা ও অনুগ্রহ করলে সে তাকে ভালো না বেসে পারে না। তাহলে যে সত্তা বান্দাকে ধারাবাহিক অবাধ্যতা সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্ন অনুগ্রহ দিয়ে ভাসিয়ে রেখেছেন, তাঁকে বান্দা কীভাবে ভালবাসবে না!

বান্দার জন্য কল্যাণকর যা কিছু আছে তিনি অবতরণ করেন, অনিষ্টকর সবকিছু নিজের দিকে উঠিয়ে নেন। তিনি বান্দা থেকে চির অমুখাপেক্ষী হয়েও স্বীয় নিয়ামত দিয়ে তার কাছে প্রিয় হতে চান। কিন্তু বান্দা প্রতি লহমায় তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়েও গুনাহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে তাঁর থেকে দূরে সরে যেতে চায়, তাঁর কাছে ঘৃণিত হতে চায়। তাঁর দান, অনুগ্রহ, কৃপা ও নিয়ামত তাকে অবাধ্যতা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না; কিন্তু তার অবাধ্যতার কারণে পরম দয়ালু প্রভু তাঁর দান অনুদান বন্ধ করে দেন না। তাহলে তাঁকে বান্দা কেন ভালবাসবে না!

দুনিয়ার যাকে বা যা কিছু আপনি ভালোবাসেন এবং যারা আপনাকে ভালোবাসে, এই ভালোবাসা মূলত নিজের জন্য, নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে ভালোবাসেন আপনার কল্যাণের জন্যই।

দুনিয়ার বাজারে যার সাথেই লেনদেন করবেন, যদি সে আপনার থেকে লাভ করতে না পারে, তাহলে আপনার সাথে লেনদেন করবে না; যে কোনো প্রকারের লাভ তার চাইই চাই। কিন্তু রাব্বুল আলামিন আপনার সাথে লেনদেন করেন আপনাকে লাভবান করার জন্য, চির উন্নত এবং বৃহৎ মুনাফা আপনাকে দান করার জন্য। সুতরাং আপনি এক দিরহাম দান করলে তা দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি একটি গুনাহ করলে, তা একটি হিসেবেই পরিগণিত হবে; আবার গুনাহই এমন বস্তু যা সবচেয়ে দ্রুত মুছে ফেলা হয়। তাহলে এতো উদার রবকে বান্দা কেন ভালবাসবে না!

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন নিজের জন্য। আর দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় জিনিষ সৃষ্টি করেছেন আপনার জন্য।

তাহলে তাঁর চেয়ে উত্তম কে আছে আপনার হৃদয়ের মণিকোঠায় জায়গা পাওয়ার মতো, সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা করার মতো!

আপনার এবং তাবৎ সৃষ্টিকুলের সমস্ত চাহিদা আকাঙ্ক্ষা ও মতলব একমাত্র তাঁর কাছেই বিদ্যমান। তিনি সবচেয়ে উদার। বড় দানশীল। বান্দা না চাইতেই তাকে আশাতীত অনেক দান করেন। অল্প আমল করলেও তা মূল্যায়ন করেন এবং তার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেন। অনেক গুনাহ ভুল ত্রুটি ক্ষমা করেন এবং মিটিয়ে দেন। আসমান জমিনে যা কিছু আছে, সবাই তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। প্রতিদিনই তাঁর নতুন নতুন কর্মসূচি থাকে। এক জনের প্রার্থনা শুনতে গিয়ে তিনি অন্য জনের প্রার্থনা থেকে উদাসীন হয়ে যান না। প্রার্থনার আধিক্য তাকে ভুলে পতিত করতে পারে না। অনুনয়কারীদের অব্যহত তাগিদে তিনি বিচলিত কিংবা বিরক্ত হন না; বরং নাছোড় প্রার্থনাকারীদের পছন্দ করেন। তাঁর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন। না চাইলে হন রুষ্ট। তিনি বান্দা থেকে লজ্জাবোধ করেন কিন্তু বান্দা তাঁর থেকে লজ্জাবোধ করে না। তিনি বান্দার দোষত্রুটি গোপন রাখেন কিন্তু বান্দা নিজের দোষত্রুটি তাঁর থেকে গোপন রাখতে পারে না। তিনি বান্দার ওপর দয়া করেন কিন্তু বান্দা নিজের ওপর দয়া করে না। নিজের নিয়ামত অনুগ্রহ ও সমর্থন দ্বারা বান্দাকে ডেকেছেন তাঁর সন্তুষ্টির পথে, কিন্তু বান্দা অস্বীকার করে। সে মিশন পূরণ করার জন্য তাদের কাছে প্রেরণ করেছেন নবী রাসুল। তাদের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজের পত্র এবং অঙ্গীকারসমূহ। আবার বান্দার চাহিদা কামনা প্রার্থনা পূরণ করার জন্য তিনি নিজেই অবতরণ করেন প্রতিনিয়ত। মমতাভরে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, 'কে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দেবো। আছে কি কেউ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো'। [৬]

যিনি সমস্ত কল্যাণের আঁধার, যিনি সবার ডাকে সাড়া দেন, যিনি ত্রুটি বিচ্যুটি সমীহ করেন, যিনি গুনাহগুলো ক্ষমা করেন, যিনি অন্যায়গুলো

[৬] আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছ এমন যে আমার নিকট চাইবে। আমি তাকে তা দেবো। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করবো। (সহিহ বুখারি ১১৪৫)

গোপন রাখেন, যিনি বিপদআপদ দূর করেন, যিনি সমস্ত আক্ষেপ মোচন করেন, সর্বোপরি যার কাছেই সমস্ত চাওয়া পাওয়া আকাঙ্ক্ষা অভিলাষের ভাণ্ডার, অন্তর সমূহ তাঁকে ভালো না বেসে কি করে থাকতে পারে?

তিনিই স্মরণের বরণের মূল্যায়নের কৃতজ্ঞতার দাসত্বের আনুগত্যের ও প্রশংসার সবচেয়ে বেশি হকদার। তিনিই বাঞ্ছিত সাহায্যকারী, সদয় প্রতাপশালী, উদার বদান্য, প্রশস্ত দানশীল। দয়া প্রার্থনা করলে তিনি দয়া করেন। তাঁর পথে যাত্রা করলে সম্মানিত করেন। তাঁর কাছে আশ্রয় নিলে মর্যাদাশীল করেন। তাঁর অপর ভরসা করলে যথেষ্ট হয়ে যান। জন্মদাতা মা নিজ সন্তানের ওঁপর যতটুকু দয়াবান, তিনি নিজ বান্দার ওপর তার চেয়েও অধিক দয়াবান। ধূসর মরুভূমিতে রসদপত্রসহ একমাত্র সম্বল উট হারিয়ে অস্থির এবং মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি হারানো উট ফিরে পেয়ে যে পরিমাণ আনন্দিত ও খুশি হয়, কোনো বান্দা তাওবা করে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি এর চেয়েও অধিক আনন্দিত হন। তিনিই সবকিছুর মালিক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। সব জিনিষই ধ্বংসশীল, একমাত্র তিনি ছাড়া। তাঁর আদেশেই বান্দা ইবাদত করতে পারে। গুনাহ করলেও তাঁর জ্ঞান অনুযায়ীই করে। তাঁর ইবাদত করলে তিনি তা মূল্যায়ন করেন। তাঁর তাওফিক ও নিয়ামতের দ্বারাই বান্দা তাঁর ইবাদত করতে পারে। বান্দা যদি তাঁর অবাধ্যতা করে, তাঁর হক নষ্ট করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি নিকট থেকে সব কিছুই দেখেন। সবকিছুই সংরক্ষণ করেন। নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ। নফসগুলোর সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান, নিয়ন্ত্রণ করেন। পরিণাম লিখে রেখেছেন । সব কিছুর সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অন্তরসমূহ তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। সমস্ত গোপনই তাঁর কাছে প্রকাশ্য। সমস্ত অদৃশ্য তাঁর সামনে দৃশ্য। দুঃখ ভারাক্রান্ত সমস্ত হৃদয় তাঁর কাছেই সমর্পিত। তাঁর নূরের জ্যোতিতে ত্রিভুবন মাতোয়ারা। সমস্ত বিবেক বুদ্ধি তাঁর প্রকৃতি উদ্ধার করতে অক্ষম। সমস্ত দলিল ও আবিষ্কার তাঁর অনুরূপ কিংবা সমকক্ষ খুঁজতে ব্যর্থ। তাঁর আলোয় সমস্ত অন্ধকার আলোকিত। আসমান জমিন তাঁর কান্তিতে উজ্জ্বল। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর দিকেই মুখাপেক্ষী। তিনি নিদ্রা যান না, নিদ্রার তাঁর কোনো

প্রয়োজন নেই। নিজ ইচ্ছানুসারে দাঁড়িপাল্লা নামান ও উত্তোলন করেন। রাত আগমনের পূর্বে দিনের, দিন উদিত হওয়ার পূর্বে রাতের সমস্ত আমল তাঁর কাছে উত্থাপন করা হয়। তাঁর পর্দা হলো নূর। যদি তিনি তা সরিয়ে দেন, তাহলে যাবতীয় সৃষ্টি পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে। সৃষ্টির কোনো চোখ তাঁর পর্যন্ত পৌঁছতে, তাকে অবলোকন করতে সক্ষম নয়।

আল্লাহ্ তায়ালার ভালোবাসা অন্তরের জন্য সঞ্জীবনী। রূহের জন্য হিতকর পথ্য। কলবের কোনো শান্তি, সুখ, স্বাদ, সফলতা ও জীবন নেই, যদি তাঁর ভালোবাসা তাতে না থাকে। চোখ জ্যোতি হারিয়ে ফেললে যতটুকু কষ্ট হয়, কান শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেললে যতটুকু দুঃখ হয়, অন্তর থেকে আল্লাহর ভালোবাসা হারিয়ে গেলে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয়। শরীর যেমন আত্মাশুন্য হয়ে গেলে পচে গলে বিনষ্ট হয়ে যায়, অন্তরও যখন নিজ সৃষ্টিকর্তা, আবিষ্কর্তা ও সত্য প্রভুর ভালোবাসাশূন্য হয়, তখন তা পচে যায়, হয়ে যায় দুর্গন্ধী। এটা তারাই অনুভব করতে পারে, তারাই সত্যায়ন করে, যাদের অন্তর সজীব ও সজাগ। মৃতকে যতই আঘাত করা হোক সে অসাড়, অনুভূতিহীন।

ফাতাহ মুসেলি রহিমাহুল্লাহ বলেন—'প্রকৃত আল্লাহপ্রেমী দুনিয়া নিয়ে কখনো শান্তি পায় না। এক নিমেষ সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হতে পারে না'।

জনৈক সালাফ বলেছেন—'প্রেমিকের অন্তর পাখির ন্যায় উড়ন্ত। অধিক জিকিরকারী। স্বউদ্যোগে অনুরাগে ভর করে সম্ভাব্য ও সামর্থ্যের সমস্ত উপায় ও মাধ্যমে সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে অবগাহন করে'।

কেউ বলেছেন—'তোমার রবের প্রেমিক হয়ে যাও, বনে যাও তাঁর সেবক; বস্তুত প্রেমিকের দল প্রেমাস্পদের সেবক হওয়াকেই নিজেদের জন্য গর্ব মনে করে'।

এক মহিলা নিজ সন্তানদের অসিয়ত করেন—'তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা ও ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে যাও। কেননা মুত্তাকীগণ ইবাদতের মধ্যেই নিজেদের শূরা খুঁজে পেয়েছেন। তাই আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। অভিশপ্ত ইবলিস যদি কখনো তাদের

সামনে কোনো গুনাহ পেশ করে, স্বয়ং গুনাহই লজ্জায় তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; কেননা মুত্তাকীগণ তা অপছন্দ করেন'।

ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করো আবার তাকে ভালোবাসার দাবীও করো। আমার জীবনের শপথ, ইনসাফের নিক্তিতে এটা বড়ই কদর্য দাবি। যদি তোমার ভালোবাসা সত্য হতো, তাহলে তুমি তাঁর অনুসরণ করতে; কেননা প্রমিক সব সময় প্রেমাস্পদের অনুসারীই হয়ে থাকে।

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

অপছন্দনিয় অনাকাঙ্ক্ষিত আপতিত বিষয়ে বান্দার দুটি স্তর রয়েছে—সন্তুষ্টির স্তর এবং সবরের স্তর। সন্তুষ্টি হলো একটি বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য। আর সবর মুমিনের ওপর আবশ্যকীয় কর্তব্য।

আল্লাহর ফয়সালা ও ভাগ্য-নির্ণয়ে যারা সন্তুষ্ট, এই শ্রেণীর লোকগণ কখনো বিপদদাতার প্রজ্ঞা, নিজ বান্দাকে বিপদের জন্য নির্বাচন করার দিকটি লক্ষ্য করে তাঁর সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেন; তাঁর ব্যাপারে কোনো অভিযোগ উত্থাপন কিংবা অপবাদ আরোপ করেন না। আবার কখনো বিপদদাতার বড়ত্ব, মহত্ত্ব এবং পরিপূর্ণতার দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রেম সাগরে ডুব দেন এবং এক পর্যায়ে কোনো কষ্ট কিংবা ব্যাথা আর অনুভব করেন না। এই স্তরে তারাই পৌঁছতে পারে, আল্লাহ্ তায়ালার ব্যাপারে যাদের রয়েছে পরিপূর্ণ জ্ঞান, যারা তাঁর প্রেমের স্রোতে অবগাহন করেছেন। তাই তো কখনো কখনো বিপদআপদ অসুখ বিসুখ নিয়েই তারা আনন্দিত হন; কেননা তাদের ভাবনায় থাকে যে, এসব তাদের বন্ধু ও প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকেই এসেছে।

সন্তুষ্টি আর সবরের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সবর, অন্তরকে অসন্তোষ ও ক্রোধ থেকে বিরত রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করার নাম। সবরের মাঝে ব্যথার অনুভতি থাকে এবং অন্তরে তা দূর হয়ে যাওয়ার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থাকে। পাশাপাশি অস্থিরতা মোতাবেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আমল থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। পক্ষান্তরে সন্তুষ্টি হলো অন্তরের প্রশান্তি, আল্লাহ্ তায়ালার নির্ণয়ের

ব্যাপারে হৃদয়ের সুস্থিরতা। এক্ষেত্রে ব্যাথার অনুভব থাকলেও তা দূর হয়ে যাওয়ার কামনা থাকে না। তবে অন্তরের মাঝে বিশ্বাস ও মারেফাতের যে সঞ্জীবনী অর্জিত হয়, তার দ্বারা এই ব্যাথার অনুভূতি লঘু হয়ে যায়। ক্ষেত্র বিশেষ যদি সন্তুষ্টির মাত্রা শক্তিশালী হয়, তাহলে পরিপূর্ণভাবেই ব্যাথার অনুভূতি দূর হয়ে যায়।

আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোনো জাতিকে পছন্দ করেন, তাদেরকে বিপদে পতিত করেন। অতএব যে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, তিনিও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ক্রুদ্ধ হয়ে যাবে, তিনিও তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে যাবেন'।[১]

ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'আল্লাহ্ তায়ালা নিজ নির্ণয় ও জ্ঞান দ্বারা আনন্দ ও আত্মিক প্রশান্তি সঁপে দিয়েছেন ইয়াকিন-বিশ্বাস এবং সন্তুষ্টির ওপর। আর বিষণ্ণতা ও দুশ্চিন্তা চাপিয়ে দিয়েছেন সংশয় ও অসন্তুষ্টির ওপর'।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يُّؤْمِنۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَه

> 'যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তার অন্তরকে সঠিক দিশা দান করেন'।[২]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আলকামা রহিমাহুল্লাহ বলেন—'ব্যক্তির ওপর কোনো বিপদ এসে চাপে। সে তখন বিশ্বাস করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে। ফলে তা মেনে নেয় এবং সন্তুষ্ট থাকে'।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

---

[১] ইবনে মাজাহ ৪০৩১; মিশকাত ১৫৬৫

[২] সূরা তাগাবুন ১১

فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً

। 'আমি তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো' ।[৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু মুয়াবিয়া আসওয়ার বলেন—'পবিত্র জীবন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সন্তুষ্টি ও অল্পেতুষ্টিময় জীবন'।

আলী রদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন আদি বিন হাতিম রদিয়াল্লাহু আনহু বিষণ্ণ হয়ে বসে আছেন। তিনি তাকে বললেন—'তোমাকে চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?' আদি রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'কেনই বা আমি বিষণ্ণ হবো না? আমার দুই ছেলে নিহত হয়েছে এবং আমার চোখ দুটোও উপড়ে ফেলা হয়েছে!' আলী রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'হে আদি, আল্লাহ্ তায়ালার নির্ণয় ও আদেশ বাস্তবায়ন হবেই। যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে, সে প্রতিদান পাবে। আর যে আল্লাহর নির্ণয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না, তার ওপর নির্ণয় বাস্তবায়ন তো হবেই; উপরন্তু তার আমলনামাও নষ্ট হবে'।

এক লোক মৃত্যুশয্যায় পড়েছিল। আবু দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে দেখলেন সে আল্লাহর প্রশংসা করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'তুমি কাজের কাজ করছো। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোনো ফয়সালা করেন, তখন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাকেই পছন্দ করেন'।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন—'যে ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে সমৃদ্ধি আসবে, বরকত পাওয়া যাবে। আর যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে না, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে না, সে তাতে বরকতও পাবে না'।

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ বলেন—'আল্লাহ্ তায়ালার ফয়সালা মেনে নেওয়া ব্যতীত আমার কোনো আনন্দের স্থান নেই'।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো—'আপনি কী কামনা করেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তায়ালা যা ফয়সালা করেন'।

আব্দুল ওয়াহিদ বিন জায়েদ রহিমাহুল্লাহ বলেন—'সন্তুষ্টি হলো আল্লাহ্

[৩] সূরা নাহল ৯৭

তায়ালার একটি বিরাট ফটক। দুনিয়ার জান্নাত এবং উপাসক ও তাপসদের প্রশান্তির স্থান'।

জনৈক সালাফ বলেছেন—'দুনিয়ায় সর্বাবস্থায় যারা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট ছিল, আখিরাতে তাদের চেয়ে উন্নত মর্যাদার আর কাউকে দেখা যাবে না। কাজেই যাকে সন্তুষ্টির বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, সে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছতে সক্ষম'।

আশা

কাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তু পাওয়ার বাসনায় অন্তর প্রফুল্ল হওয়া, এটাই আশার পরিচয়।

উপায়, মাধ্যম বা উপকরণহীন আশা করলে সেক্ষেত্রে 'আশা'র চেয়ে প্রবঞ্চনা ও বোকামি শব্দই বেশি ফিট হয়। আর যদি কোনো কাজ আবশ্যকীয় হয়, যেমন সূর্য উদয় হওয়া, তখনও 'আশা' শব্দ ব্যবহার করা যায় না। তবে হাঁ, বৃষ্টি নামবে, এক্ষেত্রে আশা শব্দ ব্যবহার করা যায়; কেননা তা প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী অবতরণ করে না।

মানব কলব বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলেন, 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। কলব তার জমি। ঈমান হলো শস্যবীজ। জমি চাষ, নিষ্কাসন, পানি সিঞ্চন এবং নদী খনন হলো ইত্যাদি হচ্ছে ইবাদত।

ঘোর দুনিয়াসক্ত কলব হলো জলাভূমির ন্যায়। সেখানে কোনো শস্য বিকশিত হয় না। কিয়ামতের দিন ফসল ঘরে নেওয়ার দিন। যে যা চাষ করেছে, সে তাই নিজের ঘরে উঠাবে। ঈমানের বীজ ছাড়া অন্য কোনো বীজ বৃদ্ধি লাভ করবে না। তদ্রূপ অপবিত্র অন্তর এবং কলুষিত চরিত্রের সাথেও ঈমান খুব কমই ফলদায়ক হবে।

জলাভূমিতে কোনো বীজ উৎপাদন হয় না। কাজেই যে বান্দা ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা রাখে, তার হতে হবে একজন দক্ষ চাষির মতো। যে উর্বর জমি চাষ করে। ভালো উপযুক্ত বীজ বপন করে। অতঃপর প্রয়োজনীয় বিরতি দেয়। এরপর আগাছা, ঘাস ও বীজ উৎপাদনে ক্ষতিকর ও প্রতিবন্ধক সবকিছু

পরিষ্কার করে। অতঃপর সমস্ত বিপদআপদ ও ঘূর্ণিঝড় থেকে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করে অপেক্ষা করতে থাকে ফসল পাকার এবং চূড়ান্ত সময়ের জন্য। তার এই যে অপেক্ষা, একেই বলে 'আশা'।

পক্ষান্তরে কোনো চাষি যদি কোনো জলাভূমি কিংবা পানি পৌঁছানো যায় না এতো উঁচু ভূমিতে বীজ বপন করে এবং জমির যথাযথ যত্নে মনোযোগ না দেয়। এরপর বসে থাকে ফসল কাটার মৌসুমের অপেক্ষায়। তার এই অপেক্ষাকে বলা হবে বোকামি, প্রবঞ্চনা; আশা নয়।

'আশা' ওই সময়ই প্রয়োগ করা যেতে পারে যখন বান্দা তার সামর্থ্যের সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করার পর কাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপেক্ষায় থাকে। তখন আর বান্দার সামর্থ্যের ভেতরের কিছু অবশিষ্ট থাকে না। যা থাকে তা হলো, বিনষ্টকারী ও ক্ষতিকর সমস্ত দুর্যোগ থেকে নিরাপদে রাখার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ। সুতরাং বান্দা যখন ঈমানের বীজ বপন করবে, তাকে সিক্ত করবে ইবাদতের পানি দ্বারা, নিজের অন্তরকে পবিত্র করবে নিকৃষ্ট মন্দ চরিত্রসমূহ থেকে, এরপর এই অবস্থার ওপর আমৃত্যু অবিচল থাকা ও ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য এবং জীবনের সুন্দর উপসংহারের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহের অপেক্ষা করতে থাকবে- তখন তার এই অপেক্ষাকে বলা হবে বাস্তব এবং কার্যকরী আশা।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰه وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

> 'যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। বস্তুত আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল এবং অসীম দয়ালু'। [১]

অর্থাৎ এরাই উপযুক্ত যে, আল্লাহর রহমতের আশা করবে। যার আশা তাকে ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, গুনাহ থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত করে,

[১] সূরা বাকারা ২১৮

তার আশাই কার্যকর আশা। আর যার আশা তাকে গুনাহ ও অবাধ্যতায় অবিচল ও নিমগ্ন থাকতে উৎসাহিত করে, সেটা আশা নয়; বরং প্রবঞ্চনা, মিথ্যে আশ্বাস।

যে আশা করবে, তার জন্য তিনটি উপাদান অপরিহার্য। এক, কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি অনুরাগ থাকা। দুই, তা হারিয়ে যাওয়া কিংবা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় থাকা। এবং তিন নম্বর হলো, তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করা। কোনো প্রত্যাশীর মাঝে যদি উপরোক্ত কোনো একটি গুণ গরহাজির থাকে, তাহলে তা আশা হিসেবে ধর্তব্য হবে না; বরং তা হবে কামনা বাসনা। আশা এবং কামনা বাসনার মধ্যে বিস্তর ফরক রয়েছে।

আশাবাদী মাত্রই শঙ্কিত। পথিক যখন চলার পথে শঙ্কিত থাকে, তখন সে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, কোনো কিছু হারিয়ে যাওয়ার আশংকায়। আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ভয় পায় সে ভোরেই রওনা করে। আর যে ভোরে রওনা করে সে গন্তব্যে স্থলে পৌঁছে যায়। মনে রেখো, আল্লাহ্ তায়ালার পণ্য খুবই মূল্যবান। শুনে রাখো, আল্লাহ্ তায়ালার পণ্য হচ্ছে জান্নাত'। [২]

কুরআন সুন্নাহয় আশা

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'বলে দিন, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল অসীম দয়ালু'। [৩]

---

[২] জামে তিরমিজি ২৪৫০

[৩] যুমার ৫৩

অন্যত্র বলেন—

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

> ‘আর মানুষের অন্যায় সত্ত্বেও (অনুতপ্ত হলে) তোমার প্রভু তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ’। [৪]

আবু মুসা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> ‘যখনই কোনো মুসলিম মারা যায়, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার স্থলে একজন ইয়াহুদি বা খৃষ্টান লোককে জাহান্নামে প্রবেশ করান’। [৫]

উমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু বন্দী আসলো। বন্দীদের মধ্যে একজন নারী হঠাৎ দৌড়ানো শুরু করলো। বন্দীদের মধ্যেই একটি শিশু পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করাতে লাগলো। এই দৃশ্য দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—‘তোমরা কি বল, এই মহিলা কি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করবে?’ আমরা বললাম, অবশ্যই না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> ‘এই মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা না দয়ালু, আল্লাহ্ তায়ালা নিজ মুমিন বান্দার ওপর তার চেয়ে অধিক দয়াবান’। [৬]

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> ‘আল্লাহ্ যখন সৃষ্টির কাজ শেষ করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাব লাওহে মাহফুজে লিখেন, ‘নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের

---

[৪] সুরা রাদ ৬

[৫] সহিহ মুসলিম ৬৯০৫

[৬] সহিহ মুসলিম ৬৮৭১

| ওপর প্রবল'। এটি তাঁর নিকট আরশের ওপরে সংরক্ষিত আছে। [৭] |

আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

'আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান, যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা পাওয়ার) আশা করতে থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক, তোমাকে আমি ক্ষমা করবো। এতে কোনো পরোয়া করবো না'।

'হে আদম সন্তান, তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো'।

'হে আদম সন্তান, তুমি যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আসো, আর আমার সাথে কাউকে শরিক না করে থাকো, তাহলে তোমার কাছে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হবো'।

ইয়াহিয়া বিন মুয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন—'গুনাহ অব্যহত রেখে অনুতপ্ত না হয়ে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার আশায় থাকা, ইবাদত না করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রত্যাশায় থাকা, জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের প্রতিক্ষা করা, গুনাহ করে ইবাদতকারিদের আবাসে থাকার কামনা করা, আমল না করেই প্রতিদান পাওয়ার অপেক্ষা করা, সীমালঙ্ঘন অপ্রতিহত রেখে আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করা—আমার কাছে সবচেয়ে প্রবঞ্চনাকর ব্যাপার'।

'আপনি মুক্তি চাইবেন কিন্তু মুক্তির পথ মাড়াবেন না, জাহাজ তো আর শুকনোর ওপর চলে না!'

---

[৭] সহিহ বুখারি ৩১৯৪

ভয়

ভয়, আল্লাহ্ তায়ালার চাবুক। এর দ্বারা বান্দাদের ইলম ও আমলের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যান। যেন তারা তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটার আশংকায় অন্তর অস্থির হওয়া এবং পোড়ানো, এটাই হলো ভয়। ভয়ই অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ ও অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখে এবং জুড়ে দেয় ইবাদতের সাথে।

অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ ভয় অবচেতনতা ও গুনাহের প্রতি দুঃসাহস করার পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে ভয়ের আধিক্যতা হতাশা ও নিরাশার গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

আল্লাহ্ তায়ালার ভয় কীভাবে সৃষ্টি হয়? আল্লাহ্ তায়ালাকে জানা, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া, তিনি চাইলে গোটা বিশ্ব ধ্বংস করে দিতে পারেন বেপরোয়াভাবে, কেউ তাকে বাধা দেওয়ার নেই, এই বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার দ্বারা কখনো ভয় সৃষ্টি হয়। আবার কখনো সীমাতিরিক্ত গুনাহ করে তা পরিত্যাগ করার দ্বারা তৈরি হয়। অনুরূপ নিজের গুনাহ সম্পর্কে ভাবা, আল্লাহ্ তায়ালাকে চেনা, তাঁর অমুখাপেক্ষিতার কথা উপলব্ধি করার দ্বারাও ভয়ের উদ্রেক হয়। আল্লাহ্ তায়ালা যা ইচ্ছা করতে পারেন, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ নেই। কিন্তু মানুষ যা করবে সেজন্য জেরার সম্মুখীন হবে, এর মাধ্যমেও ভয়ের তীব্রতা জন্ম নেয়।

যারা নিজেদের রবকে চেনে এবং নিজেদের হাকিকত সম্পর্কে অবগত, তারাই আল্লাহ্ তায়ালাকে বেশি ভয় করে। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন—

> 'আল্লাহর শপথ, আমি সবার চেয়ে আল্লাহকে বেশি জানি এবং সবার চেয়ে অধিক ভয় করি'। [১]

একবার ইমাম শা'বি রহিমাহুল্লাহকে কেউ একজন সম্বোধন করে বলল, হে আলিম! তিনি বললেন, আলিম তো সে যে আল্লাহকে ভয় করে। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয়করে'। [২]

এজন্যই বলা হয়—'যে কেঁদে কেঁদে নিজের কপোলের অশ্রু মুছে, সে প্রকৃত ভীত নয়; বরং যে কাজ করলে শাস্তি হতে পারে, তা পরিহারকারীই মূলত ভীত'।

যুননুন মিশরি রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, বান্দা কখন ভীত বলে গণ্য হয়? তিনি বললেন—'যখন সে নিজেকে ওই অসুস্থ ব্যক্তির স্থলে দাঁড় করায় যে অসুস্থতা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে আত্মরক্ষা করে'।

হাকিম আবুল কাসিম রহিমাহুল্লাহ বলেন—'কেউ কোনো জিনিসকে ভয় পেলে তার থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যে আল্লাহকে ভয় পায়, সে তাঁর দিকে ধাবিত হয়'।

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন—'যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো?' তাহলে তুমি কোনো উত্তর দেবে না। কেননা তুমি যদি হাঁ বল, তাহলে তা হবে মিথ্যে। আর যদি না বলো, তাহলে তা হবে কুফরি'।

ভয়-হারাম কামনা ও প্রবৃত্তিগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়। তখন কমনীয় গুনাহগুলো নিজের কাছে অপ্রিয় ও ঘৃণিত হয়ে ওঠে। যেমন মধু ঘৃণিত হয়ে যায় ওই ব্যক্তির কাছে, যে তাতে বিষ মেশানোর কথা জানে। সুতরাং ভয় দ্বারা প্রবৃত্তি দগ্ধ হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিশীলিত হয়। অন্তরে সৃষ্টি হয় একনিষ্ঠতা, বিনয় ও খোদাপ্রীতি । বিদায় নেয় অহংকার হিংসা বিদ্বেষ। বরং তখন ভয়ের

---

[১] সহিহ বুখারি ৬১০১

[২] সুরা ফাতির ২৮

কারণে সদা বিভোর থাকে, নিজের পরিসমাপ্তি ও ফলাফলেরর ভয়াবহতার দিকে সজাগ দৃষ্টি দেয় এবং অন্যকে নিয়ে ভাবার সময় আর পায় না। প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস মুহূর্ত লহমায় সে আত্মসমালচনা, আত্মচিন্তা ও আল্লাহ্ তায়ালার ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে। প্রতিটি পদক্ষেপ, কথা ও সিদ্ধান্তের জন্য জিজ্ঞাসিত হতে হবে, এই চিন্তায় তন্ময় হয়ে যায়। তার অবস্থা হয়ে যায় ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে কোনো হিংস্র জন্তুর ডেরায়। তার জানা নেই যে, প্রাণীটা তার থেকে বিমুখ হয়ে যাবে ফলে সে প্রাণে বেঁচে যাবে নাকি তার ওপর আক্রমণ করে তার ইহলিলা সাঙ্গ করবে? এমন অবস্থায় আপাদমস্তকে সে শুধু নিজেকে নিয়েই ভাববে; অন্যকে নিয়ে ভাবার ফুরসত তো তার হাতে নেই। যার ওপর আল্লাহর ভয় সওয়ার হয়, তার অবস্থাও এমনই হয়; সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; অন্যের দিকে তাকানোর অবকাশ পায় না।

ভয়ের তাৎপর্য ও মর্যাদা

ভীতদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা সঠিক পথের দিশা, দয়া, জ্ঞান ও সন্তুষ্টি সন্নিবেশিত করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ

'হেদায়েত ও রহমত তাদের জন্য, যারা নিজেদের প্রভূকে ভয় করে'। [৩]

অন্যত্র বলেন—

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

'আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাদের মধ্যে শুধু জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে'। [৪]

[৩] সূরা আ'রাফ ১৫৪
[৪] সূরা ফাতির ২৮

আরও বলেছেন—

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّه

| 'আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে নিজের রবকে ভয় করে'। [৫] |

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ভয়ের আদেশ দিয়েছেন। উপরন্তু তাকে ঈমানের শর্তের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ خَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

| 'তোমরা আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো'। [৬] |

অতএব, মুমিন কখনো একেবারে আল্লাহ্ তায়ালার ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে না। হাঁ তার ভয় ক্ষেত্র বিশেষ দুর্বল হতে পারে। তবে তা তার ঈমান ও আল্লাহ-জ্ঞানের কমতি ও দুর্বলতার কারণেই হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

| 'যে আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে কান্না করে সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না দুধ পুনরায় ওলানে প্রবেশ করবে'। [৭] |

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন—'যে আল্লাহেক ভয় করবে, এই ভয়ই তাকে তাবৎ কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেবে'।

শিবলি রহিমাহুল্লাহ বলেন—'আমি যে দিনই আল্লাহকে ভয় করেছি, সে দিনই কোনো প্রজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছি'।

ইয়াহিয়া বিন মুয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন—'যে কোনো মুমিন কোনো গুনাহ করলে তার জন্য দুটি নিয়ামত অপেক্ষায় থাকেঃ শাস্তির ভয় এবং ক্ষমার আশা'।

---

[৫] সুরা বাইয়িনাহ ৮

[৬] সুরা আলে ইমরান ১৭৫

[৭] সুনানে নাসাঈ ৩১০৮

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ-٥٨ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ-
٥٩ وَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ-٦٠
اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَ هُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ

> ‘যারা তাদের প্রভুর ভয়ে ভীত থাকে, যারা তাদের প্রভুর নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করে, যারা তাদের প্রভুর সাথে শরিক করে না এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারাই কল্যাণকর কাজে ধাবিত হয় এবং তারাই তাতে অগ্রগামী থাকে’। [৮]

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, “তারা যা কিছুই দান করে তাদের অন্তর ভীত-প্রকম্পিত থাকে”। আমি বললাম, এরা কি তারা, যারা মদ পান করে, জিনা করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন,

> ‘হে সিদ্দিকের মেয়ে, না; বরং তারা হলো ওই সমস্ত লোক, যারা সিয়াম পালন করে, সালাত আদায় করে, সদকা করে, আবার এই ভয় করে যে, তাদের এসব কবুল করা হবে না। এরাই কল্যাণকর কাজের দিকে ধাবিত হয়”।[৯]

আবু যর রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> ‘আমি (অদৃশ্য জগতের) যা দেখি তোমরা তা দেখ না, আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য। তাতে এমন চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও নেই যেখানে কোনো একজন ফেরেস্তা

[৮] সুরা মুমিনুন ৫৭-৬১

[৯] জামে তিরমিজি ৩১৭৫

আল্লাহ্ তায়ালার জন্য অবনত মস্তকে সাজদায় পড়ে না আছে। আল্লাহ্ শপথ, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে খুব কমই হাসতে, কাঁদতে প্রচুর, বিছানায় স্ত্রীদের ভোগ করতে না, পথে প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে এবং আল্লাহর সামনে কাকুতি মিনতি করতে। আল্লাহর শপথ, আমার মন চায় আমি যদি একটি বৃক্ষ হতাম আর তা কেটে ফেলা হতো!'। [১০]

হাদিসের মর্ম হচ্ছে, আমি আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব এবং অবাধ্যদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্পর্কে যে কথা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমাদের কান্না, অস্থিরতা এবং আগত ফলাফলের জন্য ভয় দীর্ঘায়িত ত হতো। তোমরা হাসার কথা একেবারে ভুলে যেতে।

আম্মাজান আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, 'যখন আবহাওয়া পরিবর্তন হতো এবং বিক্ষুব্ধ বাতাস প্রবাহিত হতো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কামরার মধ্যে পায়চারি করতে থাকতেন। একবার বের হতেন, আবার প্রবেশ করতেন। এসবই করতেন একমাত্র আল্লাহর আজাবের ভয়ে'। [১১]

আবদুল্লাহ বিন শিখখির রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায পড়তেন, তাঁর বুক থেকে চুলার হাঁড়ির (ফুটন্ত পানির) মতো কান্নার অস্ফুট আওয়াজ শোনা যেতো'। [১২]

সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লাহু আনহুম এবং তৎপরবর্তী এই উম্মাহর সালাফদের অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁরা যেমন আমলের দিকে শীর্ষে ছিলেন, তেমনি ছিলেন ভয়েরও চূড়ান্ত পর্যায়ে । আর আমরা তো এখন ত্রুটির সাগরে হাবুডুবু খাই; বরং গুনাহ করে আবার নিজেদের নিরাপদও ঠাওর করি!

---

[১০] জামে তিরমিজি ২৩১২

[১১] সহিহ বুখারি ৬/৩০০; সহিহ মুসলিম ৬/১৯৬

[১২] সুনানে নাসাঈ ১২১৪

আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'আমি কামনা করি, আমি যদি একজন খাঁটি মুমিন বান্দার বাহুর একটি পশম হতাম!'

তিনি যখন নামাজে দাঁড়াতেন, আল্লাহর ভয়ে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কাঁপতে থাকতেন।

উমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু সুরা তুর পাঠ করছিলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন "নিশ্চয়ই তোমার রবের আজাব পতিত হবে", কান্না জুড়ে দিলেন। তাঁর কান্না এতো প্রকট আকার ধারণ করলো যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং লোকেরা তাঁর শুশ্রূষা করলো।

ইনতিকালের সময় তিনি নিজ ছেলেকে বলেন, 'তোমার জন্য আফসোস, আমার গালকে মাটিতে রেখে দাও; হতে পারে তিনি আমার ওপর রহম করবেন'। অতঃপর বললেন—'আমার ধ্বংস হোক, তিনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন'। এ কথা তিনবার বললেন। এর কিছুক্ষণ পরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি রাতের বেলা উক্ত আয়াত পাঠ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের মধ্যেই কয়েকদিন আবদ্ধ থাকতেন। লোকেরা মনে করতো, তিনি অসুস্থ। অধিক কান্নার কারণে তাঁর চেহারায় দুটি কালো রেখা অংকিত হয়ে গিয়েছিল।

ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে একবার বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার দ্বারা কত জনপদ বিজিত করেছেন, আবাদ করেছেন কতো দেশ এবং আরও কতো খেদমত করিয়েছেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি শুধু চাই, আমি যেন নাজাত পাই; আমার কোনো প্রতিদানও থাকবে না, না থাকবে কোনো বোঝা'।

এদিকে উসমান বিন আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু যখন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, এতো পরিমাণ কান্না করতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো। তিনি বলেন, 'আমাকে যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, আর আমি না জানি যে, আমার ঠিকানা কোথায়, তাহলে ঠিকানা কোথায় তা জানার আগে আমি চাইবো ধূলিকণায় পরিণত হতে'।

আবু দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'মৃত্যুর পর তোমরা কীসের সম্মুখীন

হবে তা যদি জানতে, তাহলে আরাম করে খানা খেতে না, কখনো তৃপ্তি সহকারে পান করতে না, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কোনো ঘরে প্রবেশ করতে না; বরং রাস্তা ঘাটে পথে প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে, নিজেদের বুক চাপড়াতে এবং নিজেদের পরিণতির জন্য বিলাপ করতে থাকতে। আমি কামনা করি, আমি যদি কোনো বৃক্ষ হতাম, আর আমাকে কেটে ভক্ষণ করে ফেলা হতো!'

ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু এ পরিমাণ কান্না করতেন যে, তাঁর উভয় চক্ষুর নিচে পুরান জুতার ফিতার মতো কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল।

আলী রদিয়াল্লাহু আনহু ফজর নামায থেকে সালাম ফেরালেন। তাঁকে বিষণ্ন দেখা যাচ্ছিল। তিনি নিজ হাত ওলট পালট করছিলেন। এমন সময় বললেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু আজকের অবস্থার সাথে তাদের অবস্থার কোনো মিল নেই। তাদের অবস্থা থাকতো রিক্তহস্ত ধূলিমলিন ও আলুথালু কেশ। তাদের চোখে মেষের হাঁটুর ন্যায় দাগ পড়ে যেতো। নৈশ যাপন করতেন সাজদা, নামায ও আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে। তাদের কপাল ও পায়ের ওপর পালাক্রমে ভার ন্যস্ত করতেন। (অর্থাৎ কখনো দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন, কখনো সাজদা দিয়ে কাটিয়ে দিতেন।) সকাল হলে আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। পবনের দিনে গাছ যেভাবে দোলে, তারাও সেভাবে দুলতেন। তাদের চোখ বেয়ে নেমে আসতো বারিধারা। এমনকি তাদের কাপড় ভিজে যেতো। আর আজ আল্লাহর শপথ, আমি এক জাতি দেখছি, যারা রাত কাটিয়ে দেয় উদাসীনতায়'। এরপর তিনি উঠে চলে গেলেন। পরবর্তীতে তাঁকে আর কখনো হর্ষোৎফুল্ল দেখা যায় নি।

মুসা বিন মাসউদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা যখন সুফিয়ান সাওরির মজলিসে বসতাম, তাঁর ভয় ও অস্থিরতা দেখে আমাদের মনে হতো, আমরা আগুনে পরিবেষ্টিত হয়ে আছি।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনায় একজন বলেন, তিনি আসলে মনে হতো কোনো অন্তরঙ্গের দাফনকার্য শেষ করে আসলেন। বসলে মনে হতো তিনি একজন বন্দী, তাঁর গর্দান কেটে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর

জাহান্নামের কথা স্মরণ করলে তাঁর অবস্থা হতো এমন যে, কেমন যেন জাহান্নাম একমাত্র তাঁর জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে'।

বর্ণিত আছে, যুরারা বিন আবু আওফা রহিমাহুল্লাহ ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন। তিলাওয়াত করছিলেন সূরা মুদ্দাসসির। যখন আল্লাহ্ তায়ালার এই বাণী পাঠ করলেন 'যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সে দিন হবে অত্যন্ত কঠিন দিন'[১৩], তখন তাঁর শ্বাস ভারী হয়ে গেলো এবং তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।[১৪]

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, 'তোমরা কান্না করো। যদি কান্না না আসে তাহলে কান্নার ভান করো। ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি জানতে, তাহলে এতো পরিমাণ বিলাপ করতে যে, তোমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো। এতো পরিমাণ নামায পড়তে যে, তোমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যেতো'।[১৫]

[১৩] সূরা মুদ্দাসসির ৮-৯

[১৪] ইবার, যাহাবি ১/১০৯

[১৫] আল আহওয়াল, হাকিম ৪/৫৭৮

দুনিয়া

কুরআন সুন্নাহয় দুনিয়া সম্পর্কে বর্ণিত নিন্দাবাদসমূহ, কিয়ামত পর্যন্ত পালাক্রমিক আগত দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং কালকে উদ্দেশ্য করে করা হয় নি। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা পরস্পরের অনুগামী করে দিন ও রাত সৃষ্টি করেছেন, যেন যারা উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা রাখে কিংবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়, তাদের উপকারে আসে, তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই দুনিয়ার নিন্দা দ্বারা দিন রাত কিংবা কালকে উদ্দেশ্য নেওয়া যায় না।

বর্ণিত আছে, 'দিন ও রাত হলো দুটি খাজানা, তাই এ দুটোকে কোন কাজে ব্যয় করছো তা ভেবে দেখো'।

মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রতিটি দিন বলে, "হে আদম সন্তান, আমি আজ তোমার কাছে আগমন করেছি, পরবর্তীতে আর কোনো দিন তোমার কাছে ফিরে আসব না। তাই আমার মাঝে কি করছো ভেবে দেখো"। অতঃপর দিন শেষ হয়ে গেলে তাকে ভাজ করা হয় এবং তার ওপর সিল মেরে দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা খোলার আগে আর কখনো তা উন্মুক্ত হবে না'।

কেউ বলেছেন, 'দুনিয়া হলো জান্নাত ও জাহান্নামে যাওয়ার পথ। রাত মানুষের পণ্য আর দিন হলো বাজার'।

সুতরাং সময় হলো বান্দার মূল পুঁজি ও পাথেয়। জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'যে লোক একবার বলে 'সুবহানাল্লাহিল আযিম ওয়াবিহামদিহী', তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়'। [১]

অতএব যারা সময়কে অনর্থক কাজে ব্যয় করে, তারা ভেবে দেখুক, কত শত খেজুর গাছ হারিয়ে ফেলছে!

একজন আল্লাহ্ওয়ালা এমন ছিলেন, যখন অনেক মানুষ তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতো এবং দীর্ঘ সময় পেড়িয়ে যেতো, তখন তিনি বলতেন, 'তোমরা কি যাবে না? সূর্যের ফেরেশতা তাকে টেনে নিতে তো কোনো বিলম্ব করে না, ক্লান্ত হয় না!'

এক লোক একজন আলিমকে বলল, দাঁড়ান আপনার সাথে কথা বলবো। তিনি বললেন, 'প্রথমে সূর্যকে দাঁড় করাও'।

অনুরূপ কুরআন হাদিসে দুনিয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত নিন্দা উচ্চারণ করা হয়েছে, সে সব দুনিয়ার স্থান তথা ভূমণ্ডলের জন্যও প্রযোজ্য নয়। জমিনে অবস্থিত পাহাড় পর্বত নদী নালা সমুদ্র ও খনিসমূহেরের সাথেও সংযুক্ত নয়। কেননা এ সব তো আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেক নিজ বান্দাদের জন্য নিয়ামত স্বরূপ দান করা হয়েছে। এতে তাদের জন্য যেমন উপকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে শিক্ষাগ্রহণের উপাদান এবং স্রষ্টার একত্ব, বড়ত্ব, বিশালত্ব এবং শক্তি সামর্থ্যের নিদর্শন। কাজেই কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত নিন্দাগুলো দুনিয়ায় সংঘটিত 'মানব বংশের কর্মে'র দিকেই ফিরবে। কারণ তাদের অধিকাংশ কাজই শেষ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশংসা যোগ্য নয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন—

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ

> 'তোমরা জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন তো কেবল খেলাধুলা, বাহ্যিক সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক অহংকার এবং ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে একে অন্যের ওপরে থাকার প্রতিযোগিতা মাত্র'। [২]

[১] জামে তিরমিজি ৩৪৬৪
[২] সূরা হাদিদ ২০

আদম সন্তান দুই ভাগে বিভক্তঃ এক ভাগ হলো তারা, দুনিয়া পরবর্তী ভালো-মন্দের হিসাব নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়ার জন্য একটি স্থান আছে, যারা এ কথাকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ যারা পরকাল বা আখিরাতে অবিশ্বাসী। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ-٧ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

> 'যারা (আখিরাতে) আমার সাথে সাক্ষাৎ করার আশা রাখে না, পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও তাতেই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন, তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্মের বদলায়'। [৩]

এ সমস্ত লোকদের একমাত্র অভিলাষ হলো দুনিয়া উপভোগ করা এবং মৃত্যুর পূর্বে যতটুকু পারা যায় দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন করে নেওয়া। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَ يَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَ النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

> 'যারা কাফের, তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং আহার করে চতুস্পদ জন্তু যেভাবে আহার করে। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম'।

আর মানব বংশের দ্বিতীয় প্রকার হলো তারা, যারা মৃত্যুর পর শাস্তি ও প্রতিদানের স্থানকে বিশ্বাস করে এবং নিজেদেরকে প্রেরিত পয়গম্বরদের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে এবং নবী রাসুলের ওপর ঈমান রাখে। এরা আবার তিন ভাগে বিভক্তঃ নিজের প্রতি অত্যাচারী, মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং কল্যাণের পথে অগ্রগামী।

নিজের প্রতি অত্যাচারীঃ এই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাই অধিক। এদের

---

[৩] সূরা ইউসুন ৭

অধিকাংশই দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। অন্যায়ভাবে দুনিয়া অর্জন করছে এবং অন্যায্য পথে ব্যবহার করছে। দুনিয়াই তাদের প্রধান চিন্তা। তাদের সন্তুষ্টি ক্ষোভ বন্ধুত্ব শত্রুতা ইত্যাদি দুনিয়াকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। দুনিয়ার জন্যই তাদের বন্ধুত্ব, শত্রুতাও এর জন্যই। এরা সবাই যদিও আখিরাতের ওপর মোটামুটি বিশ্বাসী, তথাপি দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও আনন্দে মাতোয়ারা। দুনিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা অসচেতন। দুনিয়া-পরবর্তী জীবনের জন্য পাথেয় অর্জন করার ক্ষেত্র স্বরূপ, এ কথা তারা বেমালুম ভুলে গেছে।

মধ্যপন্থা অবলম্বন কারিঃ এরা দুনিয়াকে গ্রহণ করে শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায়। দুনিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। নিজের কর্তব্য পালন করার পর অবশিষ্ট অংশটুকু রেখে দেয় দুনিয়ার হালাল ও শরীয়তবৈধ কামনা বাসনা ও অভিলাষগুলো পূরণ করার জন্য। এজন্য অবশ্য তাদের কোনো শাস্তি হবে না; তবে তাদের স্তর ও মান কিছুটা কমে যাবে।

কল্যাণের পথে অগ্রগামীঃ যারা দুনিয়ার উদ্দেশ্য ও হাকিকত অনুধাবন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। তারা জানে যে, আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের দুনিয়ায় বসবাস করাচ্ছেন, ভূমিতে প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্যে কে উত্তম ইবাদত করে তা যাচাই ও পরিক্ষা করার জন্য। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন—

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

> 'পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, এদের মধ্যে কর্মে ও আমলে কে শ্রেষ্ঠ'।[৪]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের দুনিয়ার প্রতি অনুৎসাহিত করে আখিরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

[৪] সূরা কাহাফ ৭

> ‘নিশ্চয়ই ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, আমি একদিন তা সমতল প্রান্তরে পরিণত করবো’।[৫]

এই প্রকারের মানুষজন দুনিয়া থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে, অর্জন করে যা একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> ‘দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক! আমি তো ওই আরোহীর ন্যায়, যে কোনো এক গাছের নিচে বিশ্রাম গ্রহণ করে। পুনরায় চলা শুরু করে আর গাছটিকে ছেড়ে চলে যায়’।[৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমাকে অসিয়ত করেছেন—

> ‘তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো, যেন তুমি একজন পথিক কিংবা প্রবাসী’।[৭]

এই প্রকারের লোকজন যদি তাদের বৈধ চাহিদা পূরণে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জনের নিয়ত করে, তাহলে তাদের কামনাপূরণও ইবাদতে পরিণত হবে এবং এ জন্য তাদের প্রতিদানও দেওয়া হবে। মুয়াজ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি আমার নামায থেকে যেমন সওয়াবের আশা করি, আমার নিদ্রা থেকেও তেমন সওয়াবের আশা করি’।

সাইদ বিন জুবাইর রহিমাহুল্লাহ বলেন—‘তোমাকে আখিরাত-অন্বেষণ থেকে উদাসীন ও গাফেল করে দেয় যা কিছু, তাই প্রবঞ্চনার পণ্য। আর যা তোমাকে আখিরাতের স্মরণ থেকে গাফেল করে না, তা প্রবঞ্চনার পণ্য না; বরং তার চেয়ে কল্যাণকর বস্তুর দিকে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম’।

ইয়াহিয়া বিন মুয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন—‘আমি দুনিয়াকে কেন পছন্দ করবো না? অথচ এখানে আমার জীবন যাপনের জন্য খাদ্য সরঞ্জাম আছে, যার মাধ্যমে আমি ইবাদত করার শক্তি অর্জন করি; যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে’।

[৫] সুরা কাহাফ ৮

[৬] জামে তিরমিজি ২৩৭৭

[৭] সহিহ বুখারি ৬৪১৬

আবু সাফওয়ান রায়িনি রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আল্লাহহ তায়ালা কুরআনে যে দুনিয়ার নিন্দা করেছেন এবং বুদ্ধিমান মাত্রই যে দুনিয়া পরিহার করা উচিত, সেটা কোন দুনিয়া? তিনি জবাবে বললেন, 'দুনিয়ার যে উপাদান দিয়ে তুমি দুনিয়া কামনা করবে, তাই নিন্দিত ও তিরস্কৃত। আর যে উপাদান দিয়ে আখিরাত কামনা করবে, তা নিন্দিত নয়; বরং প্রশংসিত'।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন—'মুমিনের জন্য দুনিয়া কতই না উত্তম বাসস্থান; সে অল্প কিছু আমল করে এবং জান্নাতের জন্য পাথেয় অর্জন করে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফিকের জন্য দুনিয়া কতই না নিকৃষ্ট আবাস; সে দুনিয়ার রাতগুলো নষ্ট করে এবং জাহান্নামের জন্য পাথেয় অর্জন করে নিয়ে যায়'।

আবু মুসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—'যে দুনিয়াকে ভালবাসবে তার আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেবে, তার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব তোমরা যা অবশিষ্ট থাকবে তাকে প্রাধান্য দাও যা ফুরিয়ে যাবে তার ওপর।[৮]

আউন বিন আবদুল্লাহ বলেন—'অন্তরের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত হলো বাটখারার দুই পাল্লায় ন্যায়; একদিক ওপরে উঠলে অন্যদিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিচে নেমে যায়'।

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, দুনিয়া ও আখিরাতের দৃষ্টান্ত হলো—'এক ব্যক্তির দুইজন স্ত্রী আছে। সে একজনকে সন্তুষ্ট করলে অন্যজন বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়'।

আবু দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'তোমরা যদি কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে হলফ করে বলতে পারো যে, সে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি দুনিয়াবিমুখ, তাহলে আমিও হলফ করে বলতে পারবো, সে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি'।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু তাবিয়িদের লক্ষ্য করে বললেন,

[৮] মুসনাদ ৪/৪১২; ইবনে হিব্বান ৬১২

'তোমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের চেয়ে বেশি সালাত আদায় করো, অধিক সিয়াম পালন করো এবং অনেক বেশি মেহনত করো, কিন্তু তাঁরা তোমাদের চেয়ে উত্তম লোক ছিলেন'। লোকেরা বলল, হে আব্দুর রহমানের পিতা, কেন এমনটা হলো? তিনি বললেন, 'তারা তোমাদের চেয়ে বেশি দুনিয়াবিমুখ এবং আখিরাতে অনুরক্ত ছিলেন'।

দুনিয়াপ্রীতির অপকারিতা

সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা বিন মারিয়াম আলাইহিস সালাম বলতেন, 'দুনিয়াপ্রীতি সমস্ত অনিষ্টের মূল। সম্পদে রয়েছে অনেক অসুখ'। জিজ্ঞেস করা হলো, সম্পদের অসুখ কি? তিনি বললেন, 'সম্পদশালী সাধারণত অহমিকা ও গৌরব থেকে নিরাপদ থাকে না'। তারা বলল, যদি নিরাপদ থাকতে পারে? তিনি বললেন, 'তাহলে তার ব্যস্ততা তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়'।[৯]

দুনিয়ার ভালোবাসা দ্বারা জাহান্নাম আবাদ হয়। আর দুনিয়াবিমুখতা দ্বারা জান্নাত আবাদ হয়। মদের নেশার চেয়েও দুনিয়াসক্তির নেশা অনেক প্রবল। মদখোর তো কিছুক্ষণ পরেই সম্বিত ফিরে পায়; কিন্তু দুনিয়াসক্ত লোক গোরের অন্ধকারে না গিয়ে এই নেশা থেকে উঠে আসতে পারে না।

ইয়াহিয়া বিন মুয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দুনিয়া হলো শয়তানের মাদক। যে তাতে আসক্ত হয়ে যায়, সে মৃত্যুর সৈন্যদের দেখে, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে আবিষ্কার করে, অনুতপ্ত হওয়ার পূর্বে এই নেশা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

দুনিয়াপ্রীতির সবচেয়ে প্রধান অপকার হলো, তা আল্লাহর ভালোবাসা, স্মরণ ও জিকির থেকে গাফেল করে দেয়। সম্পদের কারণে যে আখিরাত থেকে উদাসীন হয়ে যায় সে ক্ষতিগ্রস্ত। অন্তর যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে উজাড় হয়ে যায়, তখন শয়তান সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে নেয় এবং যাচ্ছেতাই

---

[৯] ফাতাওয়া মিসরিয়া, ইবনে তাইমিয়া ৪৮৩; তাখরিজুল ইহইয়া, ইরাকি ৯/১৭০৪; শরহুল আলফিয়া ১/১৩৩

তাকে পরিচালনা করে। দ্বীনি ক্ষতির ক্ষেত্রে তার এমন একটি মনোভাব তৈরি হয় যে, সে অল্পকিছু ভালো কজ করে সন্তুষ্ট ও তৃপ্তির ঢেকুর তোলে এবং ভাবে যে, আমি অনেক ভালো কাজ করে ফেলেছি।

ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'দুনিয়ায় আগত সকলেই মেহমান এবং তার সম্পদ সমস্ত ধারের বস্তু; কর্জ। সুতরাং মেহমান কিছুদিন পরেই চলে যাবে আর কর্জের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে'।

দুনিয়াপ্রীতি সমস্ত অনিষ্টের মূল এবং দ্বীনের জন্য হানিকারক, এ কথার বিশ্লেষণে আল্লাহ্‌ওয়ালা উলামায়ে কেরাম কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন,

এক, দুনিয়ার ভালোবাসা দুনিয়াকে অন্তরের মাঝে সম্মানযোগ্য করে তোলে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দুনিয়া বড়ই তুচ্ছ। আর আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তুচ্ছ কোনো জিনিসকে সম্মান করা একটি বড় কবিরা গুনাহ।

দুই, দুনিয়ায় জীবন যাপন করতে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু বাদে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়াকে অভিসম্পাত করেছেন, নিন্দা করেছেন এবং এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। আর আল্লাহ্ তায়ালার অভিশপ্ত নিন্দিত ও ঘৃণিত বিষয়কে যে ভালোবাসে সে আল্লাহ্ তায়ালার ঘৃণা, ক্রোধ এবং আজাবের সম্মুখীন হয়।

তিন, যখন কেউ দুনিয়াকে ভালবেসে ফেলে, তখন সে দুনিয়াকেই নিজের চূড়ান্ত গন্তব্য স্থির করে নেয়। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা যে সমস্ত কাজকে তাঁর এবং আখিরাত পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম বানিয়েছেন, সে এগুলোকে দুনিয়া অর্জনের পেছনে ব্যয় করে। কাজেই বিষয়টি হয়ে যায় একদম বিপরীত, পরিবর্তন হয়ে যায় পুরো দর্শন।

সাকুল্যে এখানে দুটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছেঃ এক, মাধ্যম বা উপায়কে চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ে ফেলা। দুই, আখিরাতের কাজ দিয়ে দুনিয়া তালাশ করা। এই উভয়টিই সর্বদিক থেকে বিরাট নিকৃষ্ট এবং কুৎসিত ব্যাপার। দা কুমড়োর সম্পর্ককে তারা পরিবর্তন করে ফেলে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'যারা কেবল পার্থিব জীবন ও তার ঠাটবাট চায়, আমি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল এ দুনিয়াতেই ভোগ করতে দেবো এবং এতে তাদের কোনো কম দেওয়া হবে না। এরাই তারা যাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই। যা কিছু কাজকর্ম তারা করেছে তা পরকালে নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তারা যা আমল করেছে তা বাতিল বলে গণ্য হবে'। [১০]

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের মাঝে ফয়সালার জন্য অবতরণ করবেন। সকল উম্মত সেদিন নতজানু থাকবে। সর্বপ্রথম যাদের ডাকা হবে তারা হলো কুরআনের হাফিজ, আল্লাহর পথের শহীদ এবং প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী একব্যক্তি। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনের হাফেজকে বলবেন, "আমি আমার রাসুলের ওপর যা নাযিল করেছিলাম, তোমাকে কি সেই বিষয়ের জ্ঞান দেই নি?"

সে বলবে, 'হাঁ, অবশ্যই দিয়েছিলেন, হে আমার রব'। আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, "যে জ্ঞান তুমি লাভ করেছিলে, তদনুসারে কী আমল করেছিলে?" সে বলবে, 'আমি দিন রাত তা তিলাওয়াত করেছি'। আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছ'। ফেরেশতাগণও বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছ'। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বলবেন, "তুমি বরং পাঠ করেছো এ জন্য যে, মানুষ বলবে, অমুকে ক্বারি"। আর তা বলা হয়েছে।

অতঃপর নিয়ে আসা হবে ধনী ব্যক্তিকে। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বলবেন, "তোমাকে কি প্রচুর বিত্ত দেই নি? তোমাকে তো অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হতে হতো না?" সে বলবে, 'হাঁ অবশ্যই হে আমার রব'। আল্লাহ্ বলবেন,

[১০] সুরা হুদ ১৫-১৬

"তোমাকে আমি যা দিয়ছিলাম তা দিয়ে কী আমল করেছো?" সে বলবে, 'তা দিয়ে আমি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রেখেছি এবং দান সাদকা করেছি'। আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো'। ফেরেশতাগণও বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো'। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, "তোমার নিয়ত ছিল তোমাকে যেন বলা হয় অমুক ব্যক্তি খুব দানশীল"। আর তা বলে হয়েছে।

তারপর আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ব্যক্তিকে আনা হবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বলবেন, "কীজন্য তুমি নিহত হয়েছিলে?" সে বলবে, 'আমাকে আপনার রাস্তায় জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। আমি জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছি'। আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো'। ফেরেশতাগণও বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো'। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, "তুমি বরং যুদ্ধ করেছো এ জন্য যে, লোকে বলবে অমুক অনেক সাহসী"। আর তা বলা হয়েছে।

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাঁটুতে হাত চাপড়ে বললেন, 'আবু হুরাইরা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালার এই তিনজন সৃষ্টি দ্বারাই সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে'।[১১]

উক্ত হাদিসে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই। দুনিয়ার ভালোবাসা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। বরবাদ হয়ে গেছে তাদের যাবতীয় আমল। উপরন্তু তারা পরিণত হয়েছে জাহান্নামের উদ্বোধনপাত্রে।

চার, দুনিয়ার ভালোবাসা বান্দা এবং তার আখিরাতের জন্য উপকারী কাজের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়ায়। মানুষ তখন দুনিয়া ও তার প্রেমাস্পদ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকে। তবে এক্ষেত্রে মানুষের রয়েছে বিভিন্ন স্তরঃ দুনিয়ার ভালোবাসা কাউকে সরাসরি ঈমান এবং শরীয়ত থেকেই গাফেল করে দেয়। আবার অনেককে ওয়াজিব কোনো কর্তব্য পালন করতে বাধা দেয়, যদি তা দুনিয়ার স্বার্থের বিপরীত হয়; তবে কিছু ওয়াজিব কর্তব্য সে পালন করেও বটে। অনেকে আবার সময়মত ওয়াজিব পালন করতে পারে না। যেভাবে আদায় করা দরকার ছিল, সেভাবে পারে না; বরং সময়

[১১] জামে তিরমিজি ২৩৮২

ও ন্যায্যতায় গড়িমসি করে। কেউ কেউ আবার ওয়াজিব আদায় করার সময় নিজের অন্তরকে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে সোপর্দ করতে পারে না, বশে আনতে পারে না নিজের কলবকে। ফলে দেখা যায় অন্তসারশুন্য প্রকাশ্য কর্তব্য আদায় হচ্ছে। দুনিয়ার প্রেমিক ও অনুরাগীদের অবস্থা এতোটাই অশুভ যে, তারা আল্লাহর দাসত্বের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে; আল্লাহ্ তায়ালার জন্য নিজের অন্তরকে একাগ্র একনিষ্ঠ করতে পারে না; তাঁর জিকিরে নিজের জিহ্বাকে সিক্ত করতে পারে না; না পারে অন্তর ও কলবকে এক সুতোয় গাঁথতে। সুতরাং দুনিয়ার মহব্বত ও ভালোবাসা অপরিহার্যভাবে আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর; ঠিক যেভাবে আখিরাতের ভালোবাসা দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর।

পাঁচ, দুনিয়ার ভালবাসা দুনিয়াকে ব্যক্তির একমাত্র অভিলাষ ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। আনাস বিন মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে আখিরাত, আল্লাহ্ তায়ালা সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংহত করে দিবেন, তখন তার নিকট দুনিয়া আগমন করবে বাধ্য হয়ে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ্ তায়ালা সেই ব্যক্তির দুচোখে অভাব অনটন লাগিয়ে দেবেন, তার যাবতীয় কাজ এলোমেলো করে দেবেন, আর তার জন্য দুনিয়ার যতটুকু নির্দিষ্ট সে তার চেয়ে বেশি কিছু ভোগ করতে পারবে না'।[১২]

ছয়, দুনিয়াপ্রেমী দুনিয়া নিয়েই কঠোর আজাবের সম্মুখীন হয়। দুনিয়া অর্জন করতে গিয়ে, সে জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করতে গিয়ে এবং দুনিয়াবাসির সাথে লেনদের করতে গিয়ে তাকে প্রচুর পরিমাণে আজাবের সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া মৃত্যুর সাথে সাথে সবকিছু রেখে চলে যাওয়া, এটাও একটি আজাব। কবরজগতেও দুনিয়া হারানোর আক্ষেপ, তার বিপরীতে কোনো কিছু না পাওয়া এবং আখিরাতের জন্য কোনো কিছু সঞ্চয় না করার কারণে

---

[১২] জামে তিরমিজি ২৪৬৫

নির্মম আজাবের স্বীকার হতে হবে। পোকা মাকড় ও কীট পতঙ্গ তার শরীরে যে লীলাখেলা চালাবে, তার রুহ তা অনুভব করে দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা ও আফসোসে টইটম্বুর হয়ে যাবে।

মোট কথা, দুনিয়া প্রেমিক দুনিয়াতেও আজাবের মধ্যে থাকবে, কবর জগতেও কঠিন আজাবের সম্মুখীন হবে এবং নিজ রবের সাথে সাক্ষাৎ কালেও আজাবের স্বীকার হতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ لَا اَوْلَادُهُمْ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ

> 'তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিমুগ্ধ না করে। আল্লাহ্ তো চান দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে এসব জিনিষ দ্বারাই শাস্তি দিতে। আর যাতে কাফের অবস্থাতেই তাদের প্রাণ বের হয়'।

জনৈক সালাফ বলেন—'আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দিবেন ধন সম্পদ জমা করার দ্বারা, এসবের মায়া নিয়েই তাদের রুহ ত্যাগ করবে এবং এসবের ওপর আল্লাহ্ তায়ালার হক আদায় না করার ক্ষেত্রে তারা কুফরি ও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে'।

সাত, দুনিয়াপ্রেমী ও আখিরাতের চেয়ে দুনিয়ার প্রতি অধিক অনুরাগীর চেয়ে নির্বোধ ও বোকা এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই। সে কল্পনাকে প্রাধান্য দেয় বাস্তবতার ওপর। স্বপ্নকে প্রাধান্য দেয় সত্যের ওপর। অস্থায়ী ছায়ামূর্তিকে অগ্রাধিকার দেয় চিরস্থায়ী শান্তির ওপর। নশ্বর পৃথিবীকে অবিনশ্বর জান্নাতের ওপর। আখিরাতের জীবনের স্নিগ্ধতা ও প্রশান্তিকে বিক্রি করে দেয় এমন এক জীবন দ্বারা যা অলীক স্বপ্ন কিংবা বৃক্ষছায়ার ন্যায় অস্থায়ী। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো এতো সরল ধোঁকা খেতে পারে না।

জনৈক সালাফ বলেন—'দুনিয়ার ভোগে যারা ডুবে আছো, শুনে রাখো, দুনিয়ার কোনো স্থায়িত্ব নেই; অস্থায়ী ছায়া নিয়ে ধোঁকা খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়'।

সূর্যের আলো কখনো কখনো ছায়ায় ঢেকে যায়। এই ছায়া হয় অস্থায়ী এবং

ক্রমসংকুচিত। আপনি যদি তাকে ধরার লোভে তার পিছু নেন তাহলে মাঠে মারা যাবেন। এই ছায়াই হলো দুনিয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দূর থেকে রেতচমক দেখে মনে করে পানি। দৌড়ে যায় সে দিকে। কিন্তু গিয়ে সেখানে কিছুই পায় না। শুধু বালু আর বালুই দেখতে পায়। এভাবে এক সময় তার জীবনটাই শেষ হয়ে যায়। এটা দুনিয়ার উত্তম দৃষ্টান্ত।

একজন বৃদ্ধা। তার চেহারা বড় বীভৎস। তার ওপর রয়েছে অনেক অপবাদ। তার স্বামীও তার ধোঁকা থেকে রেহাই পায় নি। সে বিয়ের প্রস্তুতি নিয়েছে। সাজসজ্জা গ্রহণ করেছে নতুন বৌয়ের। ঢেকে দিয়েছে তার চেহারার মলিনতা। প্রস্তাব দেওয়ার জন্য যারা এসেছে, তাদের অনেকেই তার বাহ্যিক চেহারা দেখে পছন্দ করে ফেলেছে; তাদের দৃষ্টি বাহ্যকে অতিক্রম করতে পারে নি। তারা প্রস্তাব দিয়ে দিলো। বৃদ্ধা বলল, মোহর হলো আখিরাত ত্যাগ করতে হবে। আমি ও আখিরাত দুই সতীন। এক সঙ্গে থাকা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। পাণিপ্রার্থী তাকেই প্রাধান্য দিলো। মেনে নিলো তার শর্ত। সে বলল, প্রেয়সীকে পাচ্ছি, আখিরাত হারালেও কোনো সমস্যা নেই। বাসর রাতে যখন ঘোমটা ওঠাল, সমস্ত অলংকার খুলে ফেলল, তখন তার সামনে বাস্তবতা জাহির হলো। তারা দেখল, এর চেয়ে ধোঁকা আর কিছু হতে পারে না। এমতাবস্থায় সে হয়তো তালাক দিয়ে পালিয়ে যাবে কিংবা অন্ধের মতো থেকে যাওয়াকেই প্রাধান্য দেবে; তার বাসর রাত অতিবাহিত হবে ফাঁপা কান্না, আর্ত চিৎকার ও বিলাপে।

আল্লাহর শপথ, দুনিয়া তার প্রেমিকদের আহ্বান করে আকর্ষক ভঙ্গিতে। অনুরাগী ও পাগলেরা দলে দলে ছুটে যায় তার দিকে। দিন রাত একাকার করে তা অর্জন করার চেষ্টা করে। কেউ এক নিমেষের জন্য ক্ষান্ত দেয় না। এক পর্যায়ে দুনিয়া তার জাল বিছিয়ে দেয়। তারা সকলেই দুনিয়ার পাতা জালে ও ফাঁদে আটকা পড়ে। তখন তাদেরকে জবাই দেওয়া হয় অসহায় পশুর ন্যায়।

আহ! দুনিয়াপ্রেমীর দল কতই না অভাগা!

তাওবা

সমস্ত অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত, বান্দার গুনাহসমূহ গোপনকারী আল্লাহ্ তায়ালার দিকে গুনাহ ত্যাগ করে ফিরে যাওয়ার নামই হলো তাওবা। আল্লাহ্ওয়ালাদের পথচলা শুরু হয় এখান থেকেই । তাওবাই সফল লোকদের মূল পুঁজি। আল্লাহপ্রেমী ব্যক্তিদের প্রথম পদক্ষেপ। বিপথগামীদের পথে ফেরার কুঞ্চিকা। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হিসেবে মনোনীত ও নির্বাচিত হওয়ার প্রথম অরুণরশ্মি।

তাওবা আল্লাহর পথের পথিকদের প্রথম, মধ্যম ও সর্বশেষ- মোট কথা একমাত্র অবস্থা। খোদাপ্রেমী বান্দা আমৃত্যু তাওবা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। নিজের আবাস ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমালে তাওবাও তার সাথে সাথে পাড়ি জমায়। সবসময়ের পথচলার সঙ্গী। তার সাথেই তাওবার জীবন যাপন। সুতরাং বান্দার জীবনের সূচনা ও পরিসমাপ্তি তাওবা এবং তাওবা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَتُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো'। [১]

উক্ত আয়াতটি একটি মাদানি সুরার আয়াত। সেসময় মদিনায় অবস্থানরত মুসলমানগণ ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান ও আল্লাহ্ তায়ালার

[১] সুরা আন নূর ৩১

সর্বোচ্চ পর্যায়ের বান্দা ও নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষ; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। তাঁরা ঈমান এনেছেন, অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন, হিজরত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। এমন মানুষদের লক্ষ করে আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন তাওবা করতে! উপরন্তু সফলতাকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন তাওবার সাথে। অর্থাৎ যদি তোমরা তাওবা করো, তাহলে সফলতা অর্জন করতে পারবে; তাওবাকারি ব্যতীত কেউ সফল হতে পারবে না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

'যারা তাওবা করবে না, তারাই হলো জালিম'।[২]

আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তাওবাকারি ও জালেম। জালেম তাকে বলা হয় যে তাওবা করে না, যে নিজের রব সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁর হক সম্পর্কে উদাসীন এবং নিজের দোষ ত্রুটি ও এর ফলাফলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো। আল্লাহর শপথ, আমি দিনে সত্তর বারের চেয়েও বেশি তাওবা করি'।[৩]

বান্দা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের রাস্তা ত্যাগ করা- এটাই তাওবা।

বান্দার গুনাহ যদি আল্লাহ্ তায়ালার হক সম্পৃক্ত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাওবার তিনটি শর্ত রয়েছেঃ অনুতপ্ত হওয়া, চিরতরে গুনাহ পরিহার করা এবং পুনরায় না করার বদ্ধমূল প্রতিজ্ঞা করা।

অনুতপ্ত ও লাঞ্ছিত হওয়া ব্যতীত তাওবা সংঘটিত হওয়া সম্ভব না। কেউ যদি অন্যায় ও মন্দের ওপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত না হয়, তাহলে সে গুনাহের ওপর সন্তুষ্ট আছে, এটা তারই প্রমাণ বহন করে। ভবিষ্যতেও সে একই

---

[২] সুরা হুজুরাত ১১

[৩] সহিহ বুখারি ৬৩০৭

পদ্ধতিতে পুনরায় তা করবে বলে অনুমিত হয়। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা'। [8]

গুনাহকে পরিহার না করে, গুনাহ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাওবা করার কোনো মানে হয় না।

তৃতীয় শর্ত হলো, পুনরায় গুনাহ না করার বদ্ধমূল প্রতিজ্ঞা করা। তাওবার একনিষ্ঠতা ও সত্যতা এর ওপরই নির্ভরশীল।

পক্ষান্তরে যদি গুনাহ বান্দার হক সংক্রান্ত হয়। তাহলে তাওবাকারিকে অবশ্যই বান্দার যে হক নষ্ট করেছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, বা যার হক নষ্ট করেছে তাকে সন্তুষ্ট করে নিতে হবে। আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—

> 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করেছে সে যেন তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়, তার ভাই এর জন্য তার নিকট থেকে পুণ্য কেটে নেওয়ার আগেই। কেননা সেখানে (আখিরাতে) কোনো দীনার দিরহাম পাওয়া যাবে না; তার কাছে যদি পুণ্য না থাকে, তাহলে তার (মাজলুম) ভাইয়ের গুনাহ এনে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে'। [৫]

উক্ত গুনাহের মধ্যে দুটি হক অন্তর্ভুক্ত। একটি আল্লাহর হক, অপরটি বান্দার হক। বান্দার হক ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা তাওবার অর্ধেক আদায় হয়। বাকি অর্ধেক অবশিষ্ট থাকে অনুতপ্ত হওয়ার ওপর।

কিছু গুনাহের তাওবার জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করছি—

কেউ যদি কারও গীবত বা অপবাদের দ্বারা কারও সম্মানে আঘাত করে, তাহলে কি ওই ব্যক্তিকে জানিয়ে তাওবা করা শর্ত?

ইমাম আবু হানিফা ও মালিক রাহিমাহুমাল্লাহ'র মাজহাব হলো, 'জানিয়ে

[8] মুসনাদ, আহমদ ৩৫৫৬৮; ইবনে মাজাহ ৪২৫২
[৫] সহিহ বুখারি ৬৫৩৪

দিতে হবে'। তাঁরা উপরোক্ত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

তবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন—'জানিয়ে দেওয়া শর্ত নয়; বরং তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে তাওবা করে নেওয়াই যথেষ্ট। অথবা যে স্থানে অন্যের গীবত করেছিল বা কাউকে অপবাদ দিয়েছিল, সে স্থানে তার সুনাম নিয়ে আলোচনা করা এবং তার জন্য ক্ষমার দোয়া করাও তাওবার একটি মাধ্যম'।

কেউ যদি অন্যের মাল আত্মসাৎ করে, তাহলে তা মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি মালিক-অজ্ঞতার দরুন অথবা জীবিত না থাকার কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে ওই সম্পদ মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। তাহলে কিয়ামতের দিন পাওনাদাররা চাইলে তাদের জন্য দান কৃত সম্পদের সওয়াব নিয়ে নেবে অথবা চাইলে আত্মসাৎকারীদের পাকড়াও করে তাদের থেকে সওয়াব নিয়ে নেবে। দ্বিতীয় সূরতে আত্মসাৎকারীরা নিজেদের দানকৃত সম্পদের সওয়াব দিয়ে তা বরাবর করে নিতে পারবে; কেননা আল্লাহ্ তায়ালা তার দানের সওয়াব অযথা বরবাদ করবেন না।

বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু একবার একটি দাসী ক্রয় করলেন। যখন তার মূল্য ওজন করতে বসলেন, দাসীর মালিক চলে গেলো। তিনি তার জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আর ফিরে এলো না। অগত্যা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু দাসীর মূল্য সদকা করে দিলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ্, এটি দাসীর মালিকের পক্ষ থেকে দান। যদি সে এতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে এর সওয়াব তার ভাগে যাবে। আর যদি অস্বীকার করে, তাহলে এর সওয়াব আমার ভাগে আসবে। আর সে আমার সওয়াব থেকে সে অনুপাতে নিয়ে নেবে'।

কারও সম্পদ যদি হালাল-হারাম মিশ্রিত হয়ে যায় এবং আলাদা করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে হারাম সম্পদ পরিমাণ মাল সদকা করতে হবে। তাহলে অবশিষ্ট সম্পদ তার জন্য হালাল হবে। আল্লাহ্ তায়ালাই ভালো জানেন।

প্রশ্ন—বান্দা যখন গুনাহ থেকে তাওবা করবে, তখন কি সে গুনাহের কারণে

হারানো মর্যাদা ফিরে পাবে নাকি ফিরে পাবে না?

উত্তর—একদল উলামায়ে কেরাম বলেন, সে নিজ মর্যাদা ফিরে পাবে; কেননা তাওবা সব ধরণের গুনাহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কেমন যেন সে গুনাহই করে নি।

আরেকদল বলেন, সে আগের মর্যাদায় ফিরে যাবে না। কেননা সে গুনাহ করাকালীন নিম্নগামী ছিল। এর আগে সে ওপরের দিকে উঠছিল। গুনাহের মাধ্যমে নিম্নে অধঃপতন শুরু হয়েছে। নামতে নামতে যখন তাওবা করে ফেলবে, এই পরিমাণ মর্যাদা তার কমে যাবে এবং সে এখান থেকে নতুন করে উর্ধ্বগমনের প্রস্তুতি নেবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সহিহ কথা হলো, কতক তাওবাকারি আগের মর্যাদা ফিরে পাবে না, আবার অনেকে গুনাহের পূর্বে যে মর্যাদায় ছিল, তাওবার পর তার চেয়ে উন্নত মর্যাদায় উন্নীত হবে। দাউদ আলাইহিস সালাম তাওবা করার পর ভুল করার আগের চেয়ে বেশি মর্যাদাশীল হয়ে ছিলেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে'।

'একজন পথিক নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদে পথ চলছে। কিছুক্ষণ হেঁটে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ আরোহণ করে যাচ্ছে। মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। আবার কখনো ঘুমুচ্ছে। এভাবে চলতে চলতে এক সময় অদূরে একটি বিস্তৃত ছায়াময় ঠাণ্ডা ও তৃপ্তিদায়ক পানিবিশিষ্ট একটি সুন্দর বাগান দেখতে পেলো। তার অন্তর তাকে সে স্থানে যাত্রা বিরতি করতে উদ্বুদ্ধ করলো। সে বাগানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলো। কিছুক্ষণ পর এক ডাকাত তাকে আক্রমণ করলো। তাকে ধরে বেঁধে ফেললো এবং তার যাত্রা শেষ করে দিলো। পথিক এখন চোখের সামনে শুধু মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে। বিশ্বাস করে নিয়েছে, সে এখন মরতে যাচ্ছে, পরিণত হতে যাচ্ছে কীট পতঙ্গের খাদ্যে। এখন আর তার গন্তব্যে যাওয়া সম্ভব নয়। যখন তার মাথায় এমন চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, হঠাৎ সে দেখল, তার মাথার কাছে তার শক্তিশালী সম্মানীয় পিতা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তার বাঁধন খুলে দিলেন, তাকে শিকল মুক্ত করলেন। তারপর তাকে বললেন, গন্তব্য পানে এগিয়ে যাও। আর সাবধানে থেকো এসব শত্রুদের থেকে; পথের বাকে বাকে এরা তোমার জন্য ওঁত পেতে

বসে আছে। মনে রেখো, যতক্ষণ তুমি সতর্ক সজাগ থাকবে, সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যখনই তুমি উদাসীন ও আনমনা হয়ে যাবে, তখনই সে তোমার ওপর আক্রমণ করে বসবে। আমি তোমার আগে আগে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছি। পথনির্দেশকও মানতে পারো; আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করো'।

'এখন যদি এই পথিক চালাক, বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহলে সে আগের চেয়ে শক্তিশালী একটি যাত্রা শুরু করবে। সতর্কতার চূড়ান্ত দিয়ে এগিয়ে যাবে গন্তব্যের দিকে। শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য সদা প্রস্তুত ও সজাগ থাকবে। তাহলে তার দ্বিতীয়বারের পথচলা প্রথম বারের চেয়ে জবরদস্ত হবে এবং সে অতিদ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে যাবে'।

'পক্ষান্তরে যদি সে শত্রুর ব্যাপারে উদাসীন থাকে। আগের মতই কোনো প্রস্তুতি, সতর্কতা ছাড়াই পথ চলতে থাকে, তাহলে তার অবস্থা আগের মতই হবে। সে আবার শত্রুর ফাঁদে পা দেবে'।

'আর যদি এখন তার যাত্রায় কোনো অনীহা ও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, ওই বাগানের স্নিগ্ধ ছায়া, মিষ্ট পানি ও সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করতে থাকে, তাহলে সে আগের মতোও চলতে পারবে না; এখন তার যাত্রা আরও মন্থর হয়ে যাবে'। তাওবাকারির অবস্থাও এমন তিন রকম হতে পারে।

খাঁটি তাওবা

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

> 'হে মুমিনগণ, আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা করো। অসম্ভব নয় যে, তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত'।[৬]

[৬] সূরা তাহরিম ৮

খাঁটি ও বিশুদ্ধ তাওবা মানে হলো, তাওবাকে যাবতীয় ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও ধোঁয়াশা থেকে পরিষ্কার রাখা। হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'খাঁটি তাওবা হলো, ব্যক্তি অতীতের কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হওয়া এবং পুনরায় তা না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া'।

কালবি বলেন—'জিহ্বা দ্বারা ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা, অন্তরে অনুতপ্ত হওয়া এবং শরীর দিয়ে সংযত থাকা- এই তিনের সম্মেলনেই খাঁটি তাওবা হয়।

সাইদ বিন মুসাইয়াব রহিমাহুল্লাহ বলেন—'খাঁটি তাওবা হলো, তাওবার মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করে নেওয়া'।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাওবা বিশুদ্ধ হতে হলে তিনটি উপাদানের উপস্থিতি আবশ্যক—

এক, তাওবার সময় সমস্ত গুনাহকে ব্যাপকভাবে শামিল করা, যেন এমন কোনো গুনাহ নেই যা তার দ্বারা সংঘটিত হয় নি।

দুই, এবার সমস্ত গুনাহ পরিত্যাগ করার ওপর সংকল্প বদ্ধ হওয়া, যেন কোনো গুনাহের ব্যাপারে কোনো ধরণের সংশয়, দোটানা ও ধীরতা না থাকে; বরং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া যে, সব ধরণের গুনাহই পরিত্যাগ করবে।

তিন, আল্লাহ্ তায়ালার ভীতি, তার আজাবের ভয় এবং তাঁর প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা রেখে তাওবাকে সমস্ত কলুষতা ও বিশুদ্ধতায় ছেদ তৈরি করে এমন যাবতীয় বিষয় থেকে নির্মল রাখা।

নিজের প্রয়োজন, সম্মান, পদ ও পদবী অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বা সম্পদ ও জনবল নিরাপদের রাখার জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জন ও তাদের নিন্দা থেকে বেঁচে থাকা এবং মূর্খদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য কিংবা পার্থিব কোনো কামনা পূরণ করা এবং দারিদ্রতা থেকে মুক্তির জন্য তাওবা না করা; এসব কিছুই তাওবার বিশুদ্ধতা এবং তা আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক'।

বান্দা তখনই তাওবা করতে পারবে, যখন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে তাওফিক দান করবেন এবং তা কার্যকর হবে তখন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা তার

তাওবা কবুল করবেন। অতএব বান্দার তাওবা আল্লাহ্ তায়ালার তাওফিক ও কবুল করার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

> 'এবং সেই তিনজনের প্রতিও (আল্লাহ্ সদয় হলেন), যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখা হয়েছিল। যখন প্রশস্ত পৃথিবী তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল আর তাদের নিজেদের জীবন তাদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহর শাস্তি থেকে (পালানোর জন্য) তাঁর কাছে ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হলেন, যাতে তারা তাওবা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল, করুণাময় ।[৭]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, ওই তিনজন তাওবা করার পূর্বে তিনি তাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর অনুগ্রহের কারণেই তারা তাওবা করতে পেরেছেন। তাঁর অনুগ্রহই তাদের তাওবার মূল সোপান। আল্লাহ্ তায়ালার দুটি নাম 'আওয়াল এবং আখির' শুরু এবং শেষ- এর রহস্যই এটা যে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা তিনিই সাহায্যকারী। তিনিই উপায় তৈরি করে দেন তিনিই উপায় গ্রহণ করেন। সুতরাং বান্দাও তাওবা করে, আল্লাহ্ তায়ালাও তাওবা করেন; বান্দার তাওবা হলো, বখে যাওয়ার পর পুনরায় নিজের মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তন করা। আর আল্লাহর তাওবা হলো, অনুমতি, সক্ষমতা, সহযোগিতা দান ও কবুল করা।

তাওবার যেমন একটি সূচনা রয়েছে, তেমনি একটি পরিসমাপ্তিও রয়েছে। তাওবার সূচনা হলো, সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ তায়ালা সিরাতে মুস্তাকিমে চলার আদেশ দিয়ে বলেন—

---

[৭] সুরা তাওবা ১১৮

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِه

'আর এই হচ্ছে আমার সরল পথ। তোমরা এ পথই অনুসরণ করবে। অন্যান্য পথ অনুসরণ করবে না; তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।[৮]

আর তাওবার পরিসমাপ্তি হলো, সময় মতো তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং জান্নাতে যাওয়ার পথে অবগাহন করা। অতএব জীবন থাকতে থাকতে তাওবা করলে পরিশেষে জান্নাতে যাওয়া যাবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّه يَتُوْبُ اِلَى اللهِ مَتَابًا

'আর যে তাওবা করে এবং সৎকাজ করে, সে তো পুরোপুরি আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে'।[৯]

তাওবার রহস্য ও তাৎপর্য

বুঝমান ধীসম্পন্ন বান্দা থেকে যখন কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়, তখন তার কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মনযোগী হওয়া আবশ্যক—

এক- উক্ত কাজের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ ও নিষেধ পর্যালোচনা করা। তাহলে এই কাজটা যে ভুল তা নিশ্চিত হতে পারবে এবং নিজের গুনাহকেও স্বীকার করতে পারবে।

দুই- আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিশ্রুতি ও ধমকিগুলোর দিকে মনোনিবেশ করা। তাহলে তার অন্তরে অস্থিরতা ও ভয় তৈরি হবে, যা তাকে তাওবা করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

তিন- তার ওপর আল্লাহ্ তায়ালার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ, তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও

[৮] সূরা আনআম ১৫৩

[৯] সূরা ফুরকান ৭১

তাঁর ভাগ্য নির্ধারণের অপরিহার্যতা নিয়ে চিন্তা করবে। তিনি চাইলে তাকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন, এ কথা ভেবে দেখবে। তাহলে বান্দার অন্তরে আল্লাহ্ তায়ালার সত্ত্বা, নামসমূহ, গুণাবলী, প্রজ্ঞা, রহমত, সহিষ্ণুতা ও উদারতার জ্ঞান লাভ হবে। ফলে আল্লাহ্ তায়ালার দাসত্বের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তায়ালার নাম ও গুণাবলীসংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি, সুসংবাদ ও ধমকি সম্পর্কে জানতে পারবে। পৃথিবীতে আল্লাহ্ তায়ালার কর্ম ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্মক ধারণা লাভ হবে। এভাবে তার অন্তরে আল্লাহ্ তায়ালার মারেফত জন্ম লাভ করবে, ঈমান মজবুত হবে এবং আল্লাহ্ তায়ালার নির্ণয় ও ফয়সালা নত মস্তকে মেনে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন হবে।

চার- ভাগ্যের ক্ষেত্রে বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার মহত্ত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। পরাক্রমশালী চির পবিত্র আল্লাহ্ তায়ালা যা ইচ্ছা ফয়সালা করেন। তিনি নিজ উন্নত ক্ষমতার বলে বান্দার কলবকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করেন, বান্দার কামনা বাসনার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে যান।

ভাগ্য-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব উপলব্ধি করার আরেকটি মাধ্যম হলো এটা অনুভব করা যে, বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত, তাঁর চাহিদার সামনে অসহায় দুর্বল, তার বাগডোর আল্লাহরই হাতে। তিনি রক্ষা না করলে রক্ষা করার কেউ নেই। তিনি সাহায্য না করলে সক্ষমতা দান করার কেউ নেই। সে প্রশংসিত পরাক্রমশালী সত্ত্বার কবজায় তুচ্ছ ও নিঃস্ব।

আল্লাহর বড়ত্ব অন্তরে স্থাপন করার জন্য বান্দা এই সাক্ষ্য দেবে যে, পরিপূর্ণতা, প্রশংসা এবং সমস্ত বড়ত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। ক্রটি, দোষ, জুলুম, গুনাহ ও প্রয়োজনের কারণে বান্দা নিজেই নিন্দা ও তিরস্কারের হকদার। এভাবে সে যত বেশি আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব এবং নিজের ক্ষুদ্রতা, মুখাপেক্ষিতা ও ক্রটিপূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য দিতে থাকবে, ততই আল্লাহর বড়ত্ব, পরিপূর্ণতা, ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির বিশ্বাস তার অন্তরে বদ্ধমূল হবে।

পাঁচ- বান্দা যখন গুনাহ করে আল্লাহ্ তায়ালা তা দেখেন। তিনি চাইলেই তা প্রকাশ করে দিয়ে তাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করতে পারেন। কিন্তু তিনি

তো সাত্তার, গুনাহ গোপন কারী। তিনি অনুগ্রহ করে বান্দার গুনাহগুলো লুকিয়ে রাখেন। তদ্রূপ চাইলেই নগদে তাকে শাস্তি দিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা মায়া করে তাকে সময় সুযোগ দেন- এসব কথা চিন্তা করলে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা অনেকাংশে বেড়ে যাবে।

ছয়- আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমা ও অনুগ্রহ নিয়ে ধ্যান করা। ক্ষমা আল্লাহ্ তায়ালার একটি অপার অনুগ্রহ। তিনি যদি বান্দাকে যথাযথভাবে পাকড়াও করেন, তাহলে তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং প্রশংসিতই থাকবেন। কিন্তু তিনি নিজ অনুগ্রহে শাস্তির যোগ্য বান্দাকে ক্ষমা করে দেন- এসব নিয়ে ভাবলে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, বিনয় এবং তাঁর পরিচিতি বহুত বৃদ্ধি পাবে।

সাত- বান্দার তুচ্ছতা, মুখাপেক্ষিতা, অভাবগ্রস্ততা এবং দাসত্বের চারটি ধাপ আছে—

১- প্রয়োজন ও অভাবের তুচ্ছতা। এক্ষেত্রে তাবৎ সৃষ্টি একই সমান্তরালে।

২- দাসত্ব ও আনুগত্যের তুচ্ছতা। এটা শুধু অনুগত বান্দাদের জন্য খাস।

৩- ভালোবাসার বিনয়। ভালোবাসার পরিমাণ অনুযায়ী প্রেমিক প্রেমাস্পদের কাছে বিনয়ী হয়।

৪- গুনাহ ও অপরাধের তুচ্ছতা।

চারটি তুচ্ছতা যখন বান্দা নিজের মধ্যে দেখতে পাবে, তখন পরিপূর্ণ ও যথাযথভাবে আল্লাহর সামনে নত হতে পারবে।

আট- আল্লাহ্ তায়ালা রিজিকদাতা, তাহলে রিজিকপ্রাপ্তের উপস্থিতি আবশ্যক। আল্লাহ্ তায়ালা সবকিছু দেখেন ও শুনেন, তাহলে দেখা ও শোনার মতো কেউ থাকা অপরিহার্য। তদ্রুপ আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমাশীল, তাওবা কবুলকারী, তাহলে যাকে ক্ষমা করবেন, যার তাওবা কবুল করবেন তারও অস্তিত্ব অপরিহার্য। অন্যথায় আল্লাহ্ তায়ালার এসব নাম ও গুণাবলী অকেজো হয়ে যাবে, যা অসম্ভব।

আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞানী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই বলেন—

> 'যদি তোমরা গুনাহ না করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে এমন এক জাতি প্রেরণ করবেন, যারা গুনাহ করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে; তিনি তাদের ক্ষমা করবেন'। [১০]

আনাস বিন মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'মুমিন বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে আল্লাহ্ তায়ালা ভীষণ আনন্দিত হন। ওই ব্যক্তির চেয়ে অধিক আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি ছায়া পানিহীন আশংকাপূর্ণ বিজন মরুভূমিতে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার সাথে থাকে খাদ্য পানীয় সহ একটি সওয়ারি। ঘুম থেকে উঠে দেখে সওয়ারি হাতছাড়া হয়ে গেছে। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের ছায়ায় এসে আশ্রয় নেয়। সে তার সওয়ারির ব্যাপারে একদম হতাশ। এমন সময় দেখে যে, তার সওয়ারি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠে, 'হে আল্লাহ্, আপনি আমার বান্দার আমি আপনার রব; আনন্দের তিব্রতায় সে ভুল করে বসে। [১১]

প্রিয় পাঠক, একবার ভেবে দেখুন তো, একটি জন্তুকে আপনি ছোট থেকে লালন পালন করে বড় করেছেন। তার ভালোবাসা আপনার অন্তরে প্রোথিত। তাকে আপনি অনেক ভালোবাসেন। আপনার শত্রু তাকে বন্দী করে ফেলেছে। আপনি এখন তার নাগাল পাচ্ছেন না। আপনি জানেন যে, শত্রু তাকে ভীষণ শাস্তি দেবে। তাকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবে। আপনি এখন তার ব্যাপারে হতাশ। কিন্তু অভূতপূর্বভাবে সে শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে আপনার দরজায় এসে আপনাকে চমকে দিলো। আপনার গোবরাটের মাটিতে গাল ঘষে ঘষে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে লাগলো। এমন সময় আপনার আনন্দের পরিমাণটা কেমন হবে! আপনি যাকে লালন পালন করেছেন, নিজের মায়া মমতা দিয়ে যাকে গড়ে তুলেছেন, সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে যাকে ভালবেসেছেন, তার জন্য যদি আপনার এ পরিমাণ মায়া ও

---

[১০] সহিহ মুসলিম ৬৮৫৮

[১১] সহিহ মুসলিম ৬৮৪৮

ভালবাসা হয়, তাহলে যে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তার ওপর ঢেলে দিয়েছেন নিজ অপার অনুগ্রহের ফল্গুধারা, সে বান্দার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও মমতা কী পরিমাণ হতে পারে! পাঠক একটু ভেবে দেখবেন!

পরিশেষে আমাদের সর্বশেষ অনুরোধ থাকবে যে, সত্যতা, ইখলাস, ঈমান, দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তার জন্য আপনাদের দোয়ায় আমাদের স্মরণ রাখবেন।

আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি আমাদের ওই সমস্ত লোকের দলভুক্ত করেন, যাদের শেষ কথা হবেঃ 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। হে আল্লাহ্, আপনি আমাদের রব, সমস্ত প্রশংসা আপনারই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো প্রভু নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি'।

কিছু বই আপনার চিন্তার খোরাক জোগাবে। কিছু বই আপনাকে নিজের সাথেই পরিচয় করিয়ে দিবে। কিছু বই আপনার চিন্তা-চেতনায় নতুনত্ব নিয়ে আসবে। কিছু বই আত্মউন্নয়নের সোপান হবে। ঐ কিছু বইয়ের মধ্য থেকে এটিও একটি। এখানে রয়েছে আত্মউন্নয়নের সোপান। রয়েছে নিজেকে পরিবর্তনের বার্তা। অন্তর পরিশুদ্ধ করার নানান দিকনির্দেশনা।

পরিশুদ্ধ কলব আমাদের জন্য কতটা জরুরি—তা এই বইয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও, কীভাবে নিজেকে এসলাহ করবেন, কীভাবে ঈমানের মূল মর্ম বুঝে নিজেকে গোনাহ থেকে বিরত রাখবেন—তার বিস্তর আলোচনা রয়েছে এই ছোট্ট পুস্তিকায়।

01303743742